CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 645. May, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৫ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৪। মে, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নববর্ষ।

অতিথি আজিকে দুয়ারে এসেছি,
খোলো ওগো খোলো দ্বার;
গিয়াছে যে চলে, তাহার লাগিয়া
ফেলিও না আঁখি-ধার।
আন গো বরণ-ডালা,
মুছে আঁখি,—দাও নবাগত-গলে
নবফুলে গাঁথা মালা।

সব বাধা ফেলে, এস ওগো চলে;
কি হবে চাহিয়া পিছে?
যে গেল, তাহারে যেতে দাও সুখে;
কেন তারে স্মর মিছে?
কত লাভ, কত ক্ষতি,—
কি হবে খতায়ে? শেষ কর শুধু
মৌনে সন্ধ্যারতি।

আমারি আজিকে এই রাজাসন,
আমারি এ অধিকার,
হাত ধরে মোরে বসাও আসনে,
পিছনে চেয়ো না আর।
কাল ছিল তারি সব;
বিশ্ব-বিধিতে আজ ঘোষি তবে,
ঘরে ঘরে কলরব!

পূর্ণ কলস শোভিতেছে,
দোলে আম্রপত্র-মালা,
মঙ্গল গান গাহিতেছে, দেখ,
ঘরে ঘরে কুল-বালা!
রুদ্ধ শুধু এই দ্বার;
রাজা হ'য়ে তবু যাচকের বেশে
যাচি নিজ অধিকার!

ফুরাবে যে-দিন আমার,
সে-দিন চলিয়া যাব গো ধীরে,
কে চাহে, কেই বা নাহি চাহে,
তাহা দেখিতে চা'ব না ফিরে।
আজ নহে অবহেলা ;—
আশার তরুণ দুয়ার খুলিয়া
খেলিতে এসেছি খেলা।

নিজ-হাতে গড়া ওই মালাখানি
দাও রাণি, গলে মোর,
বরষ ধরিয়া বহিয়া বেড়া'ব
ওই তব ফুল-ডোর।

চলে যাব তার পরে,
তোমার স্মৃতির শুভ্র কুসুম শূন্য হৃদয়ে ধ'রে।

পিপাসী তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
দান কর তারে মধু ;
হাত ধরে আজ তোমারি পাশেতে
লও মোরে লও বধু !
ভরে দাও আজি প্রাণ ;
চির-জীবনের সম্বল যাচে,
দাও ভিখারীরে দান।

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

অবতরণিকা।

কর্ম্মবহুল কোলাহলপূর্ণ সংসারের কঠোর আবলা হইতে দেহ-মনকে একটু অবসর দিবার মানসে শারদীয় অবকাশে পুণ্যতীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলাম। ভ্রমণে এত আনন্দ, এত অনাবিল তৃপ্তি, পূর্ব্বে একবার কল্পনায়ও আসে নাই। ব্যাধি-জর্জ্জরিত দুর্ব্বলদেহে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আত্মশক্তির প্রতি একটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিতান্ত কাপুরুষের মত কর্ত্তব্যরাশি হইতে বহু-দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। অকস্মাৎ এক অজ্ঞাত শক্তি পরোক্ষে আমার এই ভগ্ন-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। অত্যল্প-কাল-মধ্যেই হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভ্রমণে কেন্দ্রীভূত হইল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কলিকাতা-মহানগরীর কোনও এক ছাত্রাবাসে উপনীত হইলাম। প্রথমে প্রবাসী বন্ধুবর্গের সরল উদার ব্যবহারে ভারাক্রান্ত মন মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। তাহার পর মহানগরীর বিচিত্র কোলাহল, অহোরাত্র-ব্যাপী বিপুল জনস্রোত, ফেরিওয়ালাগণের বিকট চীৎকার, মুহুর্মুহুঃ ট্রামগাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি, হাওগাড়ীর অদ্ভুত গতিবিধি, গগনস্পর্শী রম্য হর্ম্ম্যনিচয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে করিতে কোন্ সুদূর অতীতে নীত হইলাম। সুবর্ণময় ছাত্রজীবনের পুণ্যস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

এমন একদিন ছিল, প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ এবং সাহস লইয়া কর্ত্তব্য-

সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম; সহায়-সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। চতুর্দ্দিকে উল্লাস, হাসির তরঙ্গ! সকলেই উদার, সরল,—সকলেরই জীবনের লক্ষ্য এক; পরস্পর প্রীতিপাশে বদ্ধ সকলেই উচ্চভাবে প্রীতি-পুলকিত। দৈনন্দিন জীবন বিধিবদ্ধ কর্ত্তব্য-রাশি পালনে পর্য্যবসিত হইত। অতীতের এই পুণ্যময় প্রভাব বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! ছাত্রজীবনের সীমান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের এক উজ্জ্বল, মহিমমণ্ডিত, লোভনীয় প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভোগবিলাসিতা, অর্থাগম, সাধারণ্যে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, প্রত্যেকে আমায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল; আর আমি পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিলাম;—মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইলাম। কিয়দ্দূর চলিয়া দেখি, প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। অভিনব এই রাজ্য!—এ-স্থানে বাসনার তৃপ্তি নাই, কর্ম্মের অবসান নাই;—ভাবনারাশি নিতান্ত অসংযত; প্রতিকূল ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে জীবন ছিন্ন-ভিন্ন; ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সব অস্পষ্ট! নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—দারুণ পিপাসা—দারুণ অতৃপ্তি! ইচ্ছাশক্তি কিয়দ্দূর চলিয়াই পতিত হয়। আবার সব শিথিল। এ-রাজ্যে প্রদর্শক নাই,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যে-দিকে চলিবে, সে-দিকেই অজ্ঞেয় অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্ন আছে, কিন্তু লঙ্ঘন করিতে মন সরে না। কোথা হইতে আবিলতা আসিয়া দেহ-মনকে তন্দ্রাবিজড়িত করিয়া রাখে! চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা—সব যেন কুয়াসা-সমাচ্ছন্ন! অনুভূতি আছে—কখনও তীব্র, কখনও মধুর! পদার্থ আছে, কিন্তু সব বিকৃত,—কাহারও সহিত কাহারও সংসক্তি নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে এই বিশাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে একটু শৃঙ্খলা, একটু মধুরতার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণিক,—নিমেষ-মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যায়! দয়াময়, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অক্ষম, দুর্ব্বল! এই বিচিত্র প্রহেলিকা আমার দুর্ব্বোধ্য!' এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

হাবড়া ষ্টেশন।

এতাদৃশ ভাবনারাশি লইয়া মহানগরীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। অভিনব দৃশ্যাদি আমায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না;—সব শূন্যময় প্রত্যক্ষ করিলাম! অগত্যা ২রা অক্টোবর দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অগতির গতি হাবড়া-ষ্টেসন রেল-পথে যাতায়াতে ভারতের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীপালোক-পরিশোভিত সুবৃহৎ ষ্টেসন-গৃহ প্রতিক্ষণে যাত্রিকুলকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়াই উজ্জ্বল আলোকে নয়ন ঝলসিয়া গেল। তাহার পর অবিরাম পদ-সঞ্চার-শব্দ ও গতিশীল জনসঙ্ঘ! বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের স্থানে-স্থানে টিকিট বিক্রয়ের 'কেবিন'; ক্ষুদ্র গবাক্ষ-দ্বারে টিকিট-ক্রয়ার্থী মূল্য স্থাপন করিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া শ্বেতাঙ্গীগণের সুবর্ণ-কঙ্কণ-পরিশোভিত ক্ষিপ্রহস্তের পুরোভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তথায় গোলযোগ নাই—বাদানুবাদ নাই।

সকলেই আলোকের সাহায্যে স্ব স্ব টিকিট পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। যিনি নিরক্ষর, তিনি অপরের সাহায্যে তৃপ্ত হইতেছেন। তাহার-পর সকলেই দ্রব্যজাত- ও সঙ্গি-সমভিব্যাহারে 'প্ল্যাটফরমে'র দিকে ধাবিত হইতেছে।—

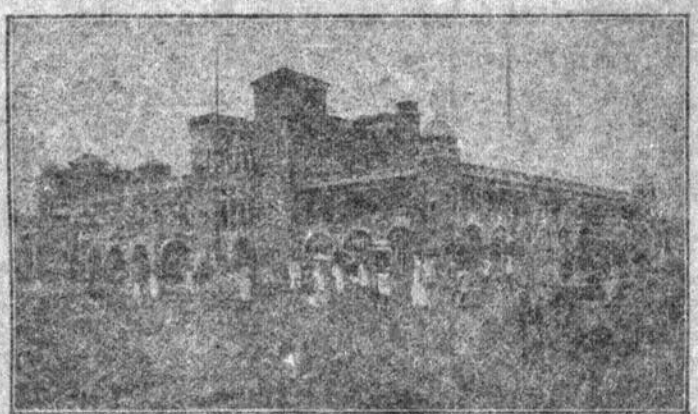

হাবড়া ষ্টেশন।

প্রবেশ-পথে নিরীহ-নির্য্যাতনকারী অজাতশ্মশ্রু সাক্ষাৎ যমদূত! দর্পভরে, রূঢ় ব্যবহারে তিনি উৎকণ্ঠা ও ভীতির মাত্রা বাড়াইয়া দিতে-ছেন। তাহারপর লৌহ-বেষ্টনী-সুরক্ষিত প্ল্যাটফরমের অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ছুটাছুটী! গাড়ী ছাড়িবার বেশী দেরী নাই—এই ভাবিয়া, সময়ের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করিয়া, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে; কেহ বা কক্ষে প্রবেশ-কালে অভ্যন্তরস্থ আরোহিগণের বিদ্রূপাত্মক আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইতেছে; কেহ অবগুণ্ঠিতা সঙ্গিনীদিগের ধীর-মন্থর পাদ-বিক্ষেপে উত্যক্ত হইয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিতেছে, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অপেক্ষা করিতেছেন;—এ-দিকে ভারবাহী দ্রব্যজাত লইয়া দ্রুতগতিতে বহুদূর চলিয়া গেল। কোনও বৃদ্ধ একটু বসিবার স্থানের জন্য সহযাত্রিগণকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন; কেহ বা ক্রোড়স্থিত রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রীড়া-পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া দিতেছেন। কেহ পয়সা লইয়া কুলীর সহিত বাদানুবাদ করিতেছে; কেহ বা প্ল্যাটফরমের একটী বেঞ্চে বসিয়া সদ্যঃক্রীত "এমপায়ার"-নামক সান্ধ্য সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন ও হস্তে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট থাকিয়া থাকিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব-মেলে স্থানাভাব ঘটিল। যাত্রাকালীন বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া পঞ্জাব-মেল চলিল; কত সুখ-দুঃখ, আশা-উৎকণ্ঠা বহন করিয়া লইয়া গেল! কত সঞ্চিত ভাবনারাশি, কত রুদ্ধ আবেগ দূর-দূরান্তে ছুটিল!

বারাণসীর পথে।

বারাণসীর একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি বোম্বে-মেলে বসিয়া পড়িলাম। আমাদের কামরায় দুইজন বাঙ্গালী।—এক-জন দার্শনিক ও মিতভাষী; তিনি উপরিস্থিত বেঞ্চে বসিয়া, বোধ হয়, দার্শনিক তত্ত্বে মনো-

নিবেশ করিলেন; অপর ভদ্রলোকটী আমার পার্শ্বে বসিয়া নানারূপ কথোপকথনে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। যদ্যপি তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল আমন্ত্রণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ছাত্রাবাস হইতে আমার পরমহিতৈষী বন্ধুবর বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রাণে একটু কষ্ট হইল; তিনি আমার অসময়ের বন্ধু; আমার অজ্ঞাতে আমার জন্য যে কত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও উপকার করিতে পারি নাই—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত বল নাই। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে হাবড়া ষ্টেসন ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া আসিলাম।

নিবিড় তমসাচ্ছন্না রজনী—বহিঃপ্রকৃতির কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। সঙ্গিগণের অনুকরণে দেহ বিস্তার করিয়া-মাত্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

অতিপ্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গয়া-ষ্টেসন আরও ১॥০ ঘণ্টার পথদ্বারা ব্যবহিত; উষারাগ-রঞ্জিতা মধুময়ী প্রকৃতি মৃদু মৃদু হাসিতেছে! কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! প্রভাত-সমীরণ উভয়পার্শ্বস্থ নিবিড় শালবন কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, মৃদু হিল্লোলে নাতিদীর্ঘ-তরুরাজি বেপথুমতী—বুঝি, একে অন্যের নিকট অস্ফুট-কণ্ঠে প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিতেছিল! অরুণোদয়ে বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়িল, আর তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি অনতিদূরে মধুচক্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, মধ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতরাজি;—যেন বিশ্রাম-প্রয়াসী অশ্বশয়ান করিযূথ! আবার বহুদূরে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বতগুলি কৃষ্ণ-নীরদবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অক্লান্ত গতিতে আমাদিগের গাড়িখানি দীর্ঘ বিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ছুটিতেছে—বিরাম নাই। অকস্মাৎ সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ! সেই বাল-রশ্মি-বিধৌত বালুকাময় প্রান্তর—বুঝি বা, সমস্ত জগৎ—মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও করালবক্ত্রে প্রবেশ করিতেছিল, তাই এই বিচিত্র অনুভূতি! বোধ হইল, যেন আমরা এক ভয়াবহ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলাম। সেই নিবিড় অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য দৈত্যকুলের ভৈরবনাদের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অরিকুলকে যেন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে আমাদের গাড়ীখানি দ্বিগুণতর বেগে বাহিরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। এবম্প্রকার অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আমরা তিনটী 'টানেল' অতিক্রম করিলাম।

প্রাতে ৬টার সময় আমাদের গাড়ি গয়া-ষ্টেসনে উপনীত হইল। অমনি ফেরিওয়ালার দল, "চাই পুরী, কচুরী", "চাই গরম চা" ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকট শব্দে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিল। যাত্রিকুল এ-দিক ও-দিক ছুটাছুটি করিতেছিল। কোনও কোনও আরোহী অবতরণ করিবামাত্রই দুর্দ্দান্ত পাণ্ডার কবলে কবলিত হইলেন। কেহ বা তাড়াতাড়ি

মুখ-হাত ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

আমাদের কামরায় ইত্যবসরে তৎপ্রদেশীয় পাঁচজন অভ্যাগত আসিয়া স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত; সকলেই থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আধার হইতে তাম্বূল-রচনান্তে চর্ব্বণ করিতেছিলেন;—সকলেই প্রৌঢ়, অথচ বেশ বিলাসী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিস্তীর টুপী তাঁহাদের শিরোদেশের মধ্যভাগ অতিসন্তর্পণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—অনাবৃত স্থানে নাতিদীর্ঘ কেশরাশি বক্রাকারে শোভা পাইতেছে। এই বেশ-বিন্যাসে তাঁহাদের যে একটী একতার আভাস পাইয়াছিলাম তাহা বঙ্গদেশে অতিবিরল।

গয়া-ষ্টেসন ছাড়িয়া ট্রেন দ্রুত-গতিতে চলিল। সৌরকরতপ্ত বালুকারাশি উত্তাপ বিকীরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ ট্রেণের গতি সংযত হওয়ায় উদ্গ্রীব হইয়া দেখিলাম, একটী বৃহৎ সেতুবন্ধ; নিম্নে প্রশান্ত শোননদ দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;—তাহাতে গর্জ্জন নাই, কল্লোল নাই, তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, তরঙ্গভঙ্গ নাই; উভয়পার্শ্বে বালুকাময় বিস্তীর্ণ পুলিন। বহুদূর পর্য্যন্ত স্বচ্ছ-সলিল ও বালুকারাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। অমিত বলে বলীয়ান্ হইয়া ধীর-গম্ভীরভাবে শোননদ যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে! তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠা বা আবেগ নাই। কিন্তু প্রাবৃট্-সমাগমে এই শোন-নদই নিতান্ত অসংযত হইয়া পড়ে এবং দুকূল প্লাবিত করিয়া ভীমবেগে সজ্জিত হয়। নদীর এই বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে আমরা বহুদূরে চলিয়া গেলাম, কিন্তু তথাপি সেতুবন্ধের শেষ নাই! এতাদৃশ সুদীর্ঘ সেতু-বন্ধ আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় সম্ভব হয় নাই।

বেলা ন্যটার সময় মোগলসরাই-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী সুবিখ্যাত জংসন। এ স্থানে আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথ সহ মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে অহোরাত্রব্যাপী যাত্রিকুলের কোলাহল এবং ব্যস্ততা! আমরা বোম্বে-মেল হইতে অবতরণ করিয়া, ওভার-ব্রীজ (overbridge) দিয়া ষ্টেসনের অপর-পার্শ্বস্থ প্লাট্‌ফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর জনতা ঠেলিয়া বহুকষ্টে একটী মধ্যম-শ্রেণীর কামরার নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এইবার সঙ্গিগণ সব বাঙ্গালী। গাড়ী অনেকক্ষণ প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইল। ইত্যবসরে অনেকেই সন্দেশাদি ক্রয় করিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। আমি নিশ্চেষ্ট; ভাবিলাম, লোকগুলি বড়ই উদর-পরায়ণ। একজন বৃদ্ধ একটী রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনীদিগের দূরত্বের জন্য নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার পরিবারাদি সকলেই স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে।

এই সময় এক প্রামাণিক আসিয়া এক সুন্দরদর্শন যুবকের চিবুকে সফেন-তুলিকা-ঘর্ষণান্তে ক্ষৌর-চালনা করিয়া দিল। কিয়ৎকাল-মধ্যেই যুবকের বদনাকৃতি সংশোধিত হইল। আমার মনে পড়িল, দ্বিজেন্দ্র-

বাবুর কথা। বর্দ্ধমান ষ্টেসনে এমনই ভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ধন্য কবিবর, ধন্য তোমার স্বাভাবিকী কল্পনা! তুমি নূতনভাবে যে হাসির উৎস ছুটাইয়া দিয়াছ, তাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া বঙ্গের প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রবাহিত থাকিবে।

গাড়ী মোগলসরাই ছাড়িয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। রাস্তার দুইধারে কত কি দেখিলাম, মনে নাই; তখন উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ক্ষণকাল পরেই সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে পাইব, নয়ন-মন সার্থক হইবে! যে পুণ্য তীর্থের নাম-স্মরণে মুমূর্ষু পুলকিত হয়, বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বল-সঞ্চার হয়—পাপী তাপীর প্রাণ শীতল হয়, আজ কত সুকৃতির ফলে প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিব, জীবন ধন্য হইবে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমরা গন্তব্যস্থানের মধ্যবর্ত্তী ডফ্‌রীন সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। গঙ্গার উপর সেই ডফ্‌রীন সেতু। তথা হইতে কাশীধামের দৃশ্য অতীব রমণীয়! দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূত-সলিলা জাহ্নবী পুণ্যতীর্থকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট শুভ্র হর্ম্ম্যাবলী দেবাধিদেব বিশ্বনাথের পবিত্র হাস্যরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। স্থানে স্থানে পবিত্র মন্দির-চূড় ত্রিদিবের সহিত পুণ্যতীর্থের নৈকট্য প্রতিপাদন করিতেছিল। গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় গতিশীল জনস্রোত! পবিত্র সলিলে অসংখ্য তরণী নাচিতেছে! এই পরম-রমণীয় দৃশ্য সন্দর্শনে প্রাণমন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল; বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

অদূরে কাশী-ষ্টেসন (রাজঘাট)। ষ্টেসনের উপকণ্ঠে একটী ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া এই ষ্টেসনেই অবতরণ করিলাম। অমনি দানবরূপী পাণ্ডাকুলের ভীষণ উপদ্রব। তাহাদের হস্তে নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। এই নিরক্ষর অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাগণ শান্তিধামকে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে; তাহাদের তাড়নায় ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়—প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

যাহা হউক, তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন কুলীকে প্রদর্শক নির্ব্বাচনান্তে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধরমশালায় উপনীত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কুলীপ্রবর দ্বিতলের একটি কক্ষে দ্রব্যজাত রক্ষা করিয়া, ঘরটী পরিষ্কার করিয়া দিল এবং ধরমশালার একজন ভৃত্যকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থলে এরূপ সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকরী, সন্দেহ নাই। ভৃত্যকে পুরস্কারের আভাস দিয়া, যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ধরমশালাটী একটী সুবিস্তীর্ণ দ্বিতল চক্‌মিলান। প্রায় তিনশত লোক একত্রে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ সুবন্দোবস্ত আছে। ভিতরে একটী প্রাঙ্গণ, তাহাতে যাত্রিদলের ব্যবহারার্থ কুসুমোদ্যান এবং জলের কল আছে। এই ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অতিবিরল।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভৃত্যের উপদেশানুসারে কক্ষদ্বারে তালা বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গঙ্গার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক ধূলি-সমাচ্ছন্ন। সৌরকরতপ্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গা খুঁজিয়া পাইতেছি না; অবসন্ন হইয়া যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকলেই গঙ্গার নৈকট্য জ্ঞাপন করে। অবশেষে প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক সঙ্কীর্ণ গলিমুখে উপনীত হইলাম ও আরও কত দূর যাইতে হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে অগণিত প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিতে করিতে কেদার-ঘাটে নামিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম।

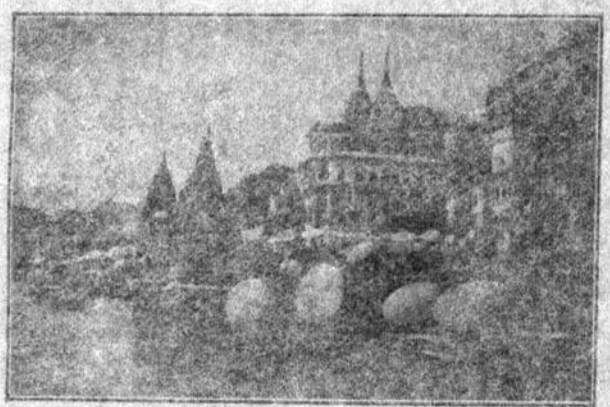

কাশীর গঙ্গা-তীর।

সহর হইতে গঙ্গা বহু নিম্নে। এজন্য তাহাকে নিকট হইতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর ও সোপানাবলীতে সহরটী সুরক্ষিত। খরস্রোতা গঙ্গা দীর্ঘাবদ্ধা। পাছে এই অমূল্য রত্নকে মা গ্রাস করিয়া ফেলেন, এইজন্য মানবের এত শ্রম এবং অধ্যবসায়। গঙ্গার অপর পার্শ্বে গঙ্গাপুলিন অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে—কোনও গ্রাম বা জনপদ তথায় নয়ন-গোচর হয় না। অদূরে রাম-নগর-রাজবাটী। রাজপ্রাসাদ গঙ্গাগর্ভের কিয়দ্দূর অধিকার করিয়া অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান।

এই স্থানে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী। অবগাহনে তৃপ্ত হইলাম—ক্লান্তি বিদূরিত হইল, প্রাণ-মন শীতল হইল; যে গঙ্গার মাহাত্ম্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারতে কীর্ত্তিত হইতেছে—যে নাম কীর্ত্তনে হিন্দুর গৃহকোণ অনুক্ষণ পবিত্র হইতেছে,—অন্তিম-শয্যায় ঘোরপাতকী যাহার আশায় উৎফুল্ল হইতেছে,—যাহার বারি বিন্দুমাত্র পান করিয়া মুমূর্ষু মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেছে, জন্মাবধি যাহার পুণ্যপ্রভাব প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, আজ সেই পূত-সলিলা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম।

কেদার-ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে কত দেব মন্দির দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও ঘণ্টা বাদিত হইতেছে, মন্দিরাভ্যন্তরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, ধূপধূম বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে; সদ্যঃস্নাত যাত্রিকুল অবিরাম

চলিতেছে ;—সর্ব্বত্র ব্যস্ততা এবং সজীবতা ! সকলের মুখে 'হর হর'-রব, সকলেই ভক্তিরসে পরিপ্লুত ।

ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল ; স্থান-মাহাত্ম্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করিলাম । দগ্ধোদরের জন্য বহুতর কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়া রন্ধন করিলাম । জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

ভারত-ভূমি ।

ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভারত-ভুবন,
অনন্ত রতন যাহে, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার !
না আছে কোথাও আর এমন তুলন,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী আমার !

পবিত্র এ পুণ্য-ভূমে লভিয়া জনম,
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি মায়ের সন্তানে ।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য যতেক করম,
না দেখি ভারত-বিনা অন্য কোন স্থানে !

অতীত কালের গর্ভে কত বর্ষ গত !
যখন আছিলা মাতা সৌভাগ্যশালিনী,
ছুটিত সীমান্ত-পথে যশোরাশি যত,
মলয়-অনীল-সম অতি-গরবিণী !

অমর-বাঞ্ছিত হেথা সুন্দর-নগরী ;
অধিষ্ঠিতা রাজ-লক্ষ্মী ভারত-আসনে !
হেরিয়ে মা'র এই অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিস্ময়ে চাহিত সবে প্রীতির নয়নে !

জ্ঞানজ্যোতিঃপূর্ণ এই ভারত-ভবনে,
অতুল বীরত্ব রাখি আর্য্য-সুতগণ
লভিল অমর কীর্ত্তি যশো-মান-ধনে ;—
স্মরিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন ।

সতীর আদর্শ-স্থল ভারত-ভুবন ;
না আছে জগত-মাঝে তুলনা ইহার ;
হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ সতীত্ব ভূষণ,—
হেলায় জীবন দেয় ধর্ম্ম করি সার !

তুমি মা জনম-ভূমি, রত্ন-প্রসবিনী !
কে বলে ভারতবাসী হইয়াছে দীন,
জননী যা'দের চির-সৌভাগ্যশালিনী,—
মাতৃস্নেহে সমতুল সুদিন-কুদিন ?

ভবিষ্য আধারে যদি গিয়াছে মিশিয়া,
আছে মাত্র আর্য্যভূমে গৌরব-কাহিনী !
কাল-নীরে স্মৃতি কভু না যাবে ভাসিয়া ;
দেখিবে ভারত-মাতা চির-গরবিণী ।

এই আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটেছে ত্রিদিব-পথে উজল প্রভায়,
ভকতি-প্রসূন ল'য়ে অমর-নগরী,
গাহিছে বন্দনা-গীতি মধুর ভাষায় ।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী ।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

আজকাল ভারতবর্ষের পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং এই বিষয়ে অনেক মতভেদও হইতেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষ যে, এখন স্ত্রী-শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-সম্বন্ধে সকলেই ভীত। আচ্ছা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, এই দুইয়ের তাৎপর্য্য কি?

অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা কেবল উপার্জ্জনের জন্য, এবং তাহার অর্থ, কেবল গোটা কতক পাশ দেওয়া; এবং স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। সেইজন্য কেহ কেহ স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? তাহারা ত আর চাকরী করিবে না? স্বাধীনতা দিলেই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িবে।' কিন্তু এই লেখাপড়া কি শুধু চাকুরীর জন্য? অথবা, কতকগুলি নভেল পাঠ করিতে ও প্রবন্ধ লিখিতে শিখিলেই কি শিক্ষার সমাপ্তি? পুরাকালে কি কেহ লেখা-পড়া জানিতেন না? এবং যাহারা জানিতেন, তাঁহারা আপনাদের অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনও সৎকার্য্য করেন নাই কি?

কি পুরুষ কি নারী, শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় বস্তু। যাহা শিখিলে মানব-জাতির অন্তঃকরণে বিশুদ্ধতা আনয়ন করিতে পারে, যাহাতে আমাদের মনের মলিনতা ধুইয়া যায়, এবং যাহাতে আমরা অন্তরের সকল প্রকার ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের ভিতরে যাইতে পারি, সেইই শিক্ষা। যখন মানবের মনে স্বার্থত্যাগ ও একতা-জ্ঞান জন্মাইবে, ও যখন মানব সকল জাতির উপর সমভাবে প্রেম বিতরণ করিতে পারিবে, তখনই শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, মনে হইবে।

তাহার পর, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। কারণ, স্ব অর্থে আপন, সুতরাং স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন। তাহার অর্থ এই যে, আপনার ইন্দ্রিয় এবং মন নিজের বশে রাখা। তাহা হইলেই সে স্বাধীন। অতএব ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়। যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ক্রূর, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী হয়, সে-স্থলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক অপরাধী হইবে না। কারণ, বিধাতার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি ন্যায়বান্ বিচারক। অতএব তিনি কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয়কেই সমদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

যদি আমরা আমাদিগের বাসনা ও রিপুসমূহের দাস্যবৃত্তি না করিয়া, সেইগুলিকে আপনাদিগের অধীনে রাখিতে পারি, যদি আমরা চিত্ত দমন করিতে শিখি, ইন্দ্রিয়-সকল সংযত হয়, তবে আমরা অধীন কোথায়? আর তখন স্বাধীনতায় কি ভয়? সে-স্থলে স্বাধীনতার প্রভাব সর্ব্বত্র। সুতরাং, স্বাধীন

হইতে হইলে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আত্মরক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। এই উপরি উক্ত বিষয়গুলি সকলই শিখিবার বিষয়। ইহা আপনা হইতেই হয় না। পুরুষ-মাত্রেই স্বাধীন; কিন্তু অনেক পুরুষও এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত, যাহাদিগকে হয় ত, সমাজ ও লোকচক্ষে শিক্ষিত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সে পদের যোগ্য নহে। কারণ, যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে যথার্থ শিক্ষিত ও স্বাধীন-পদবাচ্য হয়, তাহাদিগের মধ্যে সে সকল গুণ নাই; তাহারা এ সকল শিক্ষা করে নাই।

অতএব দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষা না পাইলে স্বাধীনতার ফল ভোগ করা যায় না; এবং যে স্বাধীন নহে, সে মনুষ্যত্বও লাভ করিতে পারে না। সৎশিক্ষা ও সাধু আদর্শই স্বাধীনতা-লাভের একমাত্র প্রধান উপায়। আমরা যেরূপ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগের বেশ-বিন্যাস করিয়া থাকি, দর্পণে প্রতিবিম্বিত আকৃতি দেখিয়া আমাদিগের সুরূপতা-কুরূপতা বিবেচনা করিয়া, সুরূপ-গ্রহণে যত্নশীল হই, সেইরূপ জগতের লভনীয় উচ্চ সাধু আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নিরন্তর সদসদ্ বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা-দ্বারা আমাদিগের স্ব-স্ব জীবন গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—আমরা এই সৎশিক্ষা ও স্বাধীনতা কোথা হইতে পাইব? শিক্ষাহীন ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় না; এবং যে অজ্ঞানী সে হতভাগ্য। মানব তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ হারাইলে যেরূপ অন্ধ হইয়া থাকে, যে হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক নাই সে ব্যক্তিও তদ্রূপ অন্ধ। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তু-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার অন্তর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশের বা প্রকাশের পথ নাই, তাহার উন্নতির পথও চিররুদ্ধ। যে জীবন উন্নতির সোপানে না উঠিয়া অবনতির দিকে নামিয়া যাইতে চাহে, সে কেবল ধ্বংসেরই লক্ষণ। যে মানব আপনার অন্ধত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সে সর্ব্বদা অবনতির মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে বিধাতৃ-বিধি অমান্য করা হয়। আমাদের অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা আবশ্যক। গীতায় আছে, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।' জ্ঞানই উন্নতির মূল সোপান। এই জ্ঞানের আধার শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎপত্তি। শিক্ষার প্রধান পথ বা উপায় বিদ্যার্জ্জন।

আমরা গুরূপদেশ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, ও সমালোচনা প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারি, তাহাকেই বিদ্যার্জ্জন করা বলে। এই বিদ্যা-বলেই মানব-সমাজ আজ পৃথিবীর সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আপনাকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাইতে হইলে, বিদ্যার্জ্জন তাহার সদুপায়। কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম, সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের বিদ্যা-দ্বারা লাভ হয়। বিদ্যা-দ্বারাই আমরা আমা-

দিগের আদর্শ খুঁজিয়া পাই, বিদ্যা সদ্বিবেচনা আনয়ন করে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে দেশের লোকেরা এখনও অশিক্ষিত ও অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য-নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিহীন অবিবেচক নর পশুর মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। স্থূলকথা,—মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র বিদ্যাই আশ্রয়ণীয়। বিদ্যা ভিন্ন শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে মনুষ্য-জীবন গঠিত হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই যে শিক্ষা, ইহা কি কেবল পুরুষের জন্যই? সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে শুধু পুরুষের শিক্ষা-লাভই কি যথেষ্ট? নর ও নারী উভয়কে লইয়াই মানবজাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, মনুষ্য বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। অতএব পুরুষের যদি শিক্ষা-লাভের আবশ্যকতা হয়, তবে স্ত্রীর হইবে না কেন? নারীজাতি কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? আর যদি নারীজাতি অন্য কোনও জাতীয় জীবের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে ধারণা হইয়া আসিতেছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, তাহা কিরূপে সম্ভব হইত? অতএব কি নারী কি নর—মনুষ্যত্ব-লাভের সার্থকতা পাইতে হইলে, শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব রক্ষাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ও মনুষ্য-পদের যোগ্য হই।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নারী-দিগকে অন্ধকারে রাখিয়া পুরুষ একা জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোকে অগ্রসর হইলে কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীঅমলা দেবী।

লক্ষ্মী-পূজা।

নমি পদযুগে হে মহালক্ষ্মি, রত্ন-আকর-সুতা,
বিশ্বরূপের প্রেয়সী গৃহিণী, বিশ্ব-বিভব-যুতা।
বন্দনহীন ধ্যান গায়ত্রী, আমি মা অধম দীন,
কুণ্ঠিত হৃদি বহিয়া এনেছি করিতে চরণে লীন।
সংগ্রহ করি শত উপচার, আয়োজনে
ঢালি প্রাণ,—
গরবে ছলিতে, আসি নি দেখাতে
কপট পূজার ভান।
ভরিয়া এনেছি নিঃস্ব হৃদয় অকপট প্রয়োজনে,
শূন্য দুহাত পাতিয়া এসেছি,
নিলাজ পীড়িত মনে।
ধরার ক্ষুধা সে, ঈর্ষা ও দ্বেষে ভরা
ছলনায় হাসি'

আনে মা জীবনে শত অতৃপ্তি, প্রমাদ,
জড়তা-রাশি!
বাঞ্ছ বিভব কামনায় তাই,
তৃষিত হৃদয়-ভাষা
ফুটে না ফুটে না; সে শুধু ছলনা,
সে যে মিছা যুচ-আশা!

চাহে না সে-সব ক্ষুধাতুর দীন, শুষ্ক মলিন আঁখি,
হে ধন-ধান্য-অধিষ্ঠাত্রি, দেহ মোরে শ্রেয় দান!
আত্মার কাছে নিত্য যা আছে,
দাও সে বিত্ত প্রাণে,
চিত্তের ক্ষুধা, তৃপ্ত কর মা, চির অমৃত দানে!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক ছিলুম সিদ্ধি কলিকায় সাজিয়া লইয়া, ভাল করিয়া উহাতে এক দম্ টানিয়া নন্দী ত্রিশূল-হস্তে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ রে, আয়—আয়। যাত্রার সময় হোলো—কে যাবি এই বেলা আয়।"

মা একখানি গৈরিক বসন পরিয়া, হাতে, কাণে, গলায় ও মস্তকে কেবলমাত্র ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া, সিংহবাহিনী হইয়া সেই-খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বিষাদে ভরা, মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন নাই—অঙ্গে একখানিও বস্ত্র-অলঙ্কার নাই।

ভৃঙ্গী ও ষাঁড়টা তাঁহার পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িতেই তাঁহার চক্ষু এইবার কেমন সজল হইয়া উঠিল। অদূরে শিবের সাধনভূমি, কয়েকটী কেতকী-বৃক্ষের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প লক্ষিত হইতেছিল। শিবের চরণ-চুম্বী তখনও মেঘ-লুক্কায়িত নবারুণের মত সেইখানে জ্বলিতেছে—দৃষ্ট হইল। সতী লুব্ধনেত্রে বারংবার সেই দিকেই চাহিতে চাহিতে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সিংহকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভূতপ্রেতগুলি, কেহবা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, কেহ বা মড়ার হাড় লইয়া, কেহ-বা ডমরু, শিঙা ও ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাকোলাহলে পার্ব্বত্যভূমি কাঁপাইয়া চলিল।

এ-দিকে এই কাণ্ড, ও-দিকে দক্ষের আলয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবাধ্য জামাতার উপরে রীতিমত প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও দক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে বাকী রাখেন নাই। ত্রিদিবের বড় বড় সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দক্ষের আত্মীয়-দিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অসংখ্য কন্যার মধ্যে সতী ছাড়া সকলেই

পতিপুত্র ও অন্যান্য পরিজনসহ উপস্থিত। জামাতারা প্রত্যেকেই এক এক দিকে এক এক কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্র ও অগ্নি—ইহারা সকলেই দক্ষের জামাতা;—তাঁহাদের ছুটাছুটিতে ও হাকে-ডাকে দক্ষপুরী সরগরম! কেহ নিমন্ত্রিতদের আহার্য্য পরিবেশন করিতেছেন, কেহ যজ্ঞস্থলের জিনিষপত্রাদির খবরদারি করিতেছেন, কেহ-বা আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে মন দিয়াছেন।

চন্দ্র নিতান্ত সুশীল; তিনি অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে যজ্ঞের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবর লইতেছেন। যমরাজ শাসনকার্য্যে অত্যন্ত পটু;—তিনি চারিদিকের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। অগ্নি আমোদ-প্রমোদাদির সুশৃঙ্খলা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনগণ আরও অসংখ্য কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলে দক্ষ কহিলেন, "আর দেরী কেন? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইতে পারে।"

ভৃগু প্রভৃতি কয়েক জন ঋষি এই শিবহীন যজ্ঞে দক্ষের প্রধান সহায়। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ও ভগবান্ প্রজাপতি কি কহেন, তাহা জানা দরকার।"

বিষ্ণু চুপ করিয়া একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। শিবের অভাবটা তাঁহার চক্ষে যজ্ঞভূমিটাকে নিতান্তই অসহ্য ও অপ্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ঈষৎ মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তাই তো! ভগবান্ প্রজাপতি কি বলেন?"

ব্রহ্মাও নির্বানন্দ এবং অন্যমনস্ক ছিলেন। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশেষ কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, আর দেরী কেন? যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।"

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল। মহাসমারোহে ভৃগু অন্যান্য কয়েক-জন হোতার সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষ আসিয়া সদস্যে নিকটে বসিলেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আবার ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "নারদের সহিত একটু বাক্যালাপ করিয়া আসি, ক্ষণিক অপেক্ষা কর।" সে কথা শুনিয়া দক্ষ ঈষৎ ভ্রূকুটী করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।—সকলেই স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে সুগভীর 'কিচিমিচি' শব্দ উত্থিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মাথা তুলিতেই দক্ষ দেখিলেন—এক অদ্ভুত দৃশ্য। দক্ষ দেখিলেন, দর্শকদিগের সেই বিষম জনতার মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কাল কাল কি! কি-বা উহাদের চেহারা, এবং কি-বা উহাদের বিকট আনন্দোচ্ছ্বাস! হি হি করিয়া তাহারা হাসিতেছে, আর দর্শক-দিগকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, আপনাদের জন্য যতটা পারে, সম্মুখে জায়গা করিয়া লইতেছে! দক্ষ আরও দেখিলেন, কয়েকটা আসিয়া পা ছড়াইয়া একবারে সম্মুখেই আরাম করিয়া বসিল। সমস্ত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা ও অপ্সরা-দের মধ্যে তাহাদের বিকটমূর্ত্তিগুলি অতিশয় অদ্ভুতভাবে 'চিকমিক্' করিতে লাগিল।

দক্ষ বুঝিতে পারিলেন, কোন্ রাজ্যের মহামান্য আগন্তুক ইহারা। যদিই-বা প্রথমে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, কিন্তু বাহিরের

দুই একটী কলরবে অবিলম্বেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কোথা হইতে আসিল?"

সে উত্তর করিল, "সতী আসিয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

দক্ষ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না; রাগিয়া কহিলেন, "কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! নিমন্ত্রণ করিলাম না, তবু আসিল! আচ্ছা রসো, মজা দেখাইতেছি!" তারপর উচ্চৈঃস্বরে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন, "সব আপদ্‌গুলোকে তাড়াইয়া দাও; ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও!"

ভূতেরা অতশত জানে না। মায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ;—কত খাইবে, নাচিবে—মনে করিয়া আসিয়াছে। এখন খাদ্যের পরিবর্ত্তে কীল-ঘুষোর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গেল! কোন সভাতেই কেহ তাহাদের এমন "দূর দূর" করে না। আজ মায়ের সঙ্গে আসিয়া এই অপমান! তাহারা বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিতে লাগিল, আর দুম-দাম করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

জননী প্রসূতির নিকট বসিয়া সতী অভিমানাশ্রু পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভূতেরা কহিল, "তাড়াইয়া দিল যে!"

দুর্-দুর্ করিয়া সতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কে তাড়াইয়া দিলে? কেন তাড়াইয়া দিলে?"

"যজ্ঞস্থল হইতে প্রহরীরা তাড়াইয়া দিয়াছে; আর শুধু তাড়াইয়াই দেয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে মার-ধরও করিয়াছে!" এই বলিয়া ভূতেরা যে-যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইতে লাগিল। কেহ পীঠ দেখাইল, তাহার চামড়া উঠিয়া গিয়াছে; কেহ নাক দেখাইল, অনেকটা নাই; কেহ কান দেখাইল, টানের চোটে তাহা লম্বা হইয়া গিয়াছে!

সতীর অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভূত হইল! মাতার নিকটে ছেলেপিলে, যত কুৎসিত-কদাকারই হউক, যত অপদার্থই হউক, অতুল স্নেহের পাত্র! সতীও ইহাদিগকে তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "ওকি মা অমন করিলে কেন? ভাবিও না; আমি মিটাইয়া দিতেছি! ও-সব কিছু নয়। জামাতারা কোথা গেল?"

অভিমানের বহ্নি সতীর অন্তরে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। শিবকিঙ্করদের উপায় করিবেন ওই জামাতারা? এতই তুচ্ছ শিব? ছি! ছি! ছি!

প্রসূতি চলিয়া গেলেন। সতী আস্তে আস্তে যজ্ঞভূমির দিকে চলিলেন। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেই আরও একটী দৃশ্য তাঁহার নয়ন-সম্মুখে পতিত হইল।

সতীকে নামাইয়া দিয়া সিংহটা গাছতলায় পড়িয়া আরাম করিতেছিল; একটা অনুচর তাহাকে খোঁচা লইয়া তাড়িয়া আনিল। তাহা দেখিয়া সে-ও কেশর নাড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সতী দেখিলেন, একটীমাত্র

শূলের খোঁচা খাইতেই সে একেবারে লাফাইয়া, তাহার ঘাড়ের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়া দিয়াছে আর কি। সতী তাড়াতাড়ি সিংহকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

সিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ, লেজ প্রসারিত, কেশরগুচ্ছ অসম্ভবরূপ স্ফীত। গায় হাত বুলাইয়া সতী তাহাকে কহিলেন, "ছি! ছি! পশুরাজ, ও কি!—ছি!" তারপর অনুচরটীর সম্মুখে যাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইলেন। অনুচর সতীকে সম্মুখে দেখিয়া, হঠাৎ, "মা, আমার দোষ নাই; প্রজাপতির হুকুম আমি পালন করিয়াছি মাত্র," এই বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সতী কথা কহিতে না পারিয়া এইবার যজ্ঞবেদীর নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন। দক্ষ মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সতীকে দেখিয়া কহিলেন, "ভাঙ্গড়ের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তোরও লজ্জা-সম্ভ্রম গেল, দেখিতেছি! ছি! ছি! ছি! সতি, কে তোকে এই সব জন্তু ও লোকদের লইয়া আসিতে বলিল?"

সতী পিতা ও অন্যান্য গুরু-ব্যক্তিকে অভিবাদন জানাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পিত্রালয়ে কন্যা আসিবে, তাহার আবার অনুমতি কি পিতঃ? আমি নিজের ইচ্ছাতেই এইখানে আসিয়াছি, এবং ইহাদিগকেও আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। ইহাতে কি অপরাধ হইয়াছে?"

লজ্জায় ও ঘৃণায় দক্ষ মুখ বিকৃত করিলেন; কহিলেন, "সে জ্ঞান তোর থাকলে হ'ত! তা'হলে কি তুই ভাঙ্গড়ের সেবা করিস্? না, শিবের কথাতেই এইসব ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে এইখানে আসতে সাহস পাস?"

দারুণ মনস্তাপে সতী কহিয়া উঠিলেন, "যিনি কোনও দোষে দোষী নন্, দোষ-গুণের যিনি অতীত, কল্পনা করিয়া কেন তাঁহাকে বৃথা কটূক্তি করেন, পিতা? শুনিলাম, শিবহীন যজ্ঞ করিতেছেন। ইহা কি আপনার উচিত? না, ইহা নিরাপদ? শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে পারে? সে তো দেবতাদেরও অসাধ্য।"

দক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি? কন্যা হইয়া এত বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কহিস্! আমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গড় স্বামীর গর্ব্ব! আচ্ছা, রোস্; তোর শিবের অহঙ্কারটা ভাঙিতেছি। একবার তার কাহিনীটা বলি তবে—শোন্।"

এই বলিয়াই দক্ষ সদম্ভে মস্তক তুলিয়া সেই সম্মিলিত দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক শিব-নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গায়ের জ্বালায় শিবের কত কুৎসাই দক্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—শিব ভাঙ্গড়—ভাঙ্ খায়; শিব অনাচারী—যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকে; শিবের মানসম্ভ্রম-জ্ঞান নাই, যত ছোট লোকের সঙ্গেই তার মেলা-মেশা;—নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেতগুলা তার নিত্যসাথী; শিব আস্ত জন্তু;—ব্যাঘ্রছাল পরে—সাপের হার কণ্ঠে দেয়।"—এইরূপ আরও কত কি বলিয়া দক্ষ যে শিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন তাহা বলা দুষ্কাঠিন।

দক্ষ বলিয়া যাইতেছেন, আর সভাস্থিত সকলে মগ্ন হইয়া শুনিতেছে; এমন সময় অকস্মাৎ সতীর দিকে চাহিয়া নিষ্ঠুর বক্তা হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। দক্ষের বাক্য-রোধের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের দৃষ্টিও সেই দিকে পড়িল;—তাঁহারাও তখন স্তব্ধ

হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে দিতে হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চাহিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন! তাঁহাদের হস্তস্থিত পাত্র আর নামিতে চাহিল না! একটা কি শক্তিতে চরাচর যেন এক মুহূর্ত্তে স্পন্দনহীন হইয়া গেল!

সকলে দেখিলেন, দেবী নিশ্চল পাষাণবৎ আকাশ-পথে দৃষ্টি স্থির করিয়া করযোড়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার সামান্য বস্ত্রাঞ্চলটীও যেন যোগমগ্ন হইয়া স্থির হইয়া আছে! শীর্ণ কাঞ্চনপ্রভ-কায়, অঙ্গস্থিত কুসুমরাশির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর সহিত মিলিয়া, পবিত্রতার আলোকে চারিদিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই পবিত্রতার মধ্যে, তাঁহারই প্রাণের মত, সকল মূর্ত্তিই ধ্যান-মগ্ন! বাহিরের কোন কিছুতেই যেন সে মূর্ত্তির কোন অনুভূতি নাই। চক্ষের দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ হইলেও অন্তরের মধ্যেই তাহার সাধনার বস্তু পাইয়া সে তন্ময়! দেহের ও অন্তরের মধ্যে একখানি যেন সুস্পষ্ট আবরণ টানিয়া দিয়া দেবী যজ্ঞাগ্নির পার্শ্বে ক্রোধে রুদ্র দেখিতেছেন!

সতীর এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, দূরে গবাক্ষ-সমীপে দাঁড়াইয়া প্রসূতি আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সতি, সতি, মা আমার! চলে আয়; বুকের ধন আমার, বুকে আয় মা! আয়, ওখানে থাকিস্ নে; বুকে আয়!" একটা আশু বিপদের সম্ভাবনা জননীর স্নেহকাতর হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার সেই কাতর আহ্বান যজ্ঞস্থলে অনেকেই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু সতীর ধ্যান-মগ্ন অন্তরের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া উহা তাঁহাকে কিছুতেই সচেতন করিয়া তুলিতে পারিল না। সতী ক্রমেই অসাড়—আরও অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অতিবিচিত্র ব্যাপারই সংঘটিত হইল।

সতীর দেহ ক্রমে নমিত হইল ও চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। একটী রেখার মত জ্যোতিঃ হঠাৎ সেই দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে ধূপশিখার মত যজ্ঞাগ্নিতে মিলাইয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহটিও কুণ্ডের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া গেল!

চারিদিকে প্রবল আর্ত্তনাদ উঠিল। গবাক্ষপার্শ্বে প্রসূতি, "সতি, সতি" বলিয়া এইবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দর্শকগণ, "এ কি হইল, এ কি সর্ব্বনাশ," বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন; এক্ষণে এক গগনভেদী হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনিও ত্রিশূল-হস্তে লাফাইয়া উঠিলেন। সিংহ ব্যাপার কি, এতক্ষণ ভাল বুঝিতে পারে নাই; সকলকে সমবেত-স্বরে চীৎকার করিতে এবং দেবীর দেহকে ঐরূপভাবে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে লম্ফপ্রদানে কুণ্ডের সম্মুখীন হইল। পিশাচেরা 'কিল্ বিল্' করিয়া যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ করিয়া মহাগোলযোগ বাঁধাইয়া দিল। এমন কি, এমন যে দক্ষ, তাঁহারও মুখ হইতে অলক্ষ্যে একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হইল।

কিন্তু এ সবই এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র! —তাহার পরেই এক মহামারী কাণ্ড! নন্দীর হুঙ্কারে ও ত্রিশূল-চালনায়, সিংহের দাপটে ও ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে, তেমন যে যজ্ঞস্থল, তাহাও মুহূর্ত্তে পিশাচ-ভূমিতে

পরিণত হইল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেবতা—প্রাণভয়ে সকলেই পলায়নপর হইলেন। সাহস করিয়া প্রতিবাদ বা সম্মুখীন হইবার মত কাহাকেও পাওয়া গেল না। দক্ষ নিরুপায় হইয়া সশঙ্কে ভৃগুর দিকে চাহিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হয় দেখিয়া, (ভৃগু তাড়াতাড়ি কি করিবেন!)—যজ্ঞরক্ষার কামনায় যজ্ঞাগ্নিতে একটা প্রকাণ্ড আহুতি দিয়া বসিলেন। সেই আহুতি হইতে হঠাৎ এক উজ্জ্বলাকৃতি বীরের উদ্ভব হইল। উহার নাম ঋভু! হস্তে প্রকাণ্ড এক খড়্গ! দক্ষের ইঙ্গিতে সে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রবল বিক্রমে সকলকে যজ্ঞভূমি হইতে তাড়াইতে লাগিল; এবং যজ্ঞভূমি ক্রমশঃ পরিষ্কার করিয়া দিল। তাহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া নন্দী ও ভূতের দলকেও অবশেষে প্রস্থান করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

মিশ্র সাহানা—কাওয়ালি।

বরিষ আশিস্-কণা য়ুরোপের মাঝে!
প্রীতির মঙ্গল ভেরি প্রতিপ্রাণে বাজে!
য়ুরোপের ঘরে ঘরে
দীপ জ্বলে পুণ্য-করে,
প্রতি আঙ্গিনায় তব হেম-পীঠ রাজে,
সিঞ্চহ নির্ব্বাণ-বারি উহাদের মাঝে॥

মুছে যাক্ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব,
যত মোহ যত সন্দ,
উঠুক্ সকল চিত্তে সাধনার মহানন্দ;
সাজাও য়ুরোপ-চিত্ত ধর্ম্মময় সাজে।
প্রেমের আলোকে সব,
পাক্ শান্তি অভিনব,
হে রাজাধিরাজ! বুঝি' তব বৈভব
বিরত হয় যেন ভ্রাতৃ-হিংসা কাজে॥*

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´ ৩
॥ (মা মা রা মা। রা রা সা সা। রা-া পা মপা। ম: মা -জ্ঞা -া)॥
ব রি ষ আ শি স্ ক ণা য়ু • রো পে র মা ঝে •

১ ২´ ৩
। মা -পা পা পা। ণধা-ধণা পা -ধা। মা পা-র্সা র্সা। মজ্ঞা-া-জ্ঞমা-পা ॥
প্রী তি র ম ঙ্গ ল • ভে রি প্র তি প্রা ণে বা • জে • •

১ ২´ ৩
॥ । মা -া -া মা। -া -া মা -া। র্সা র্সনা র্সা র্রা। না -া র্সা র্সা ।
য়ু • • রো • • পে • • র • • ঘ রে • ব রে

* মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউসনের জনৈক ছাত্র-কর্ত্তৃক বিরচিত।

০ ১ ২ ৩
| মা -র্সা র্রা র্রজ্ঞা | র্রা -র্সা র্সা -র্রা | -া -র্সা র্সণা ণা | -ধা ণা ধা ণা} |
নী • • প • • • ক্ষ • • জে • • পু ণা • ক রে

০ ১ ২ ৩
| মা -পা পা পা | ণা পা পা পা | মা -পা পা মা | মা র্সা র্সা র্সা |
প্র • তি আ ক্ষি মা ন ত ব • হে য় পী ঠ রা জে

০ ১ ২ ৩
| মর্সা -র্রা র্সা ণা | ধা পা পা পধা | মা -পা পধা পধপা | মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা ||
সিন্ ধু হ নি র্মা ণ বা রি • উ হা দে • য় মা • • জে •

০ ১ ২ ৩
|| মা পা -া ণা | -ধা ণা ধা পা | -া পা ধা মা | পা পা পা পা |
মু • • হে • • মা • • কু • • দে ব দ্ব ন্দ্ব

০ ১ ২ ৩
| মা পা -া র্সা | -া -া র্সা -া | ণা ধা ণা -ধা | মপা -ধা পমা মজ্ঞা |
ব • • ত • • মো • • হ • • য় • ত স • • ন্ন

০ ১ ২ ৩
| জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা মা | রা রা রা সা | রা রা সা সা |
উ ঠ কু স ক ল চি ত্তে সা ধ না র ম হা ন ন্দ

০ ১ ২ ৩
| রা মা মা পা | পা পা পা -া | ণা -ণা ধা মা | পা পা পা -া } |
সা জা ও য় রো প চি • ত ধ র্ম ম য় সা জে •

০ ১ ২ ৩
| {মা -া -া মা | -া -া মা -া | র্সা -মা র্সা র্রা | মা মা র্সা র্সা |
প্রে • • মে • • র • • আ • • লো কে স ব

০ ১ ২ ৩
| মা সা র্রা র্রা | -া জ্ঞা র্রা র্সা | -া মা র্সা র্রা | র্সা ণা ণা ধা } |
প্র • • কু • • শা • • স্তি • • অ ভি ন ব

০ ১ ২ ৩
| ণা -ধা ণা ধা | ণা -া পা পা | মা পা পা পা | র্সা -া র্সা র্সা |
হে • রা জা ধি • রা জ বু দ্ধি ত ব বৈ • ভ ব

০ ১ ২ ৩
| র্রা র্সর্রর্সা ণা -ধা | ণা ধা পা পধা | মা পা ধা পধপা | মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা ||
বি র • ত • হ য় যে • ন আ ত্ম হিং • সা কা • • জে •

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৫

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে কোন্ সৌভাগ্য-বলে এক দিন এমন সুখী হইয়াছিল! কেন সে সুখ চিরদিন থাকিল না? সুপ্রকাশ আসা পর্য্যন্ত সে কি হোটেলে থাকিতে পারে না? —না। তাহা হইলে সে পাগল হইয়া যাইবে। সে তাহা কোনও মতে পারিবে না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া সেই পুরাতন প্যাকেটটি,—যাহাতে 'লীলাবতী দাস' লেখা ছিল,— খুলিয়া দেখিল, একখানি পত্র। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা।—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অর্থ পাইলাম। ধন্যবাদ। আপনি কি আর এখানে আসিবেন না? আপনাকে একবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনি দুঃখিনীর প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। আমার ছেলে-দুইটি ভাল আছে। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার দাসী—
লীলাবতী।"

পত্রে এমন কোনও কথা নাই, যাহাতে অন্যের ভাব বিকৃত হয়। যদি কাগজে মকদ্দমার কথা না পড়িত, শীলা ইহাতে কিছুই মনে করিত না। এই নির্জ্জন স্থানে সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে কি করিবে! সে তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিল। তাহার স্বামীকে এই সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। সে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও ভাবই মনে স্থির করিয়া আনিতে পারিল না; উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল :—

"আমি লক্ষ্ণৌ যাইতেছি; কাকাবাবুর বাটীতে থাকিব। মিঃ সুব্রত বসু আসিয়া এই কাগজ ও চিঠি দিয়াছেন; দিলাম, দেখিও। আমি জানি না, কি করা উচিত বা কি বলা উচিত। তুমি যাহা বুঝাইতে পার, বুঝাইও। এখানে কোনও মতে থাকিতে পারিতেছি না—"

পত্র অসমাপ্ত রহিল,—আর লেখা হইল না। শীলার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, সে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আয়া পার্শ্বের ঘরে ছিল; ছুটিয়া আসিয়াই শীলাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দুখ্‌মন বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া আয়াজী?"

আয়া। আরে মেম্‌সা'ব কা হো গিয়া! জল্‌দি ডাগ্‌দার বোলাও। সাহেব কিধর গিয়া?—কব আয়েগা?*

দুখ্‌মন। সা'ব কাল আয়েগা। হাম্ জানেসে হোগা নেই। হোটেলকো ডাগ্‌দারকে বোলানেসে হোগা।†

---

* আরে, মেমসাহেব কি-রকম হয়ে গেছেন? শীঘ্র ডাক্তার ডাক। সাহেব কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?

† সাহেব কাল আসিবেন। আমি যাইলে হইবে না। হোটেলের ডাক্তারকে ডাকিলে হইবে।

Imp 3916 dt-27/8/09

সুব্রত পূর্ব্বের সেই কক্ষেই বসিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বের ঘরে চীৎকার প্রভৃতি শুনিতেছিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া দুখমন সেই স্থানে আসিল। ডাক্তার ইংরাজ। তিনি সুব্রতকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তদুত্তরে সুব্রত বলিলেন, "আমি জানি না। আমি এইমাত্র আসিয়াছি; তবে, মিসেস্ রায় কোনও সংবাদ পাইয়াছেন।"

ডাক্তার আয়ার সহিত গিয়া শীলাকে শয্যার উপর তুলিয়া শয়ন করাইলেন। জ্ঞান কিছুতেই হইল না দেখিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, 'পুনরায় আসিয়া দেখিব' এই বলিয়া ডাক্তার যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শৈলেন আসিয়াছেন। শৈলেন সেই তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "Where is Mr. Roy?" *

শৈলেন। He has gone to Kalka; will return tomorrow. †

ডাক্তার বলিলেন, "Mrs. Roy is very ill. The case looks serious. You ought to send a telegram to Mr. Roy to come positively by tomorrow's train. I hope that somebody will look after her. I will come by and by." ‡ এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শৈলেন সুব্রতকে দেখিয়া বলিলেন, "মশায় কি এইখানেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ, আমি মিসেস্ রায়ের পরিচিত।

শৈলেন। হঠাৎ পীড়িত হইবার কারণ কি?

সুব্রত। কারণ—? হয় ত, আমিই কারণ! আমি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন একটা কথা বলেছিলাম।

শৈলেন। সুপ্রকাশ রায়ের বিরুদ্ধে কথা! আপনি, বুঝি, তাঁকে জানেন না?—সর্ব্বনাশ কোরেছেন!—

এমন সময় আয়া চীৎকার করিয়া "দুখমন! দুখমন!" বলিয়া ডাকিল। শৈলেন ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, শীলা একেবারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সে শয্যায় স্থির থাকিতেছে না; খুব জ্বরও হইয়াছে। আবার ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, একজন 'নার্স' না হইলে চলিবে না। নর্স একজন এখনই চাই। শৈলেন নর্স আনিতে চলিয়া গেলেন ও টেলিগ্রামে সুপ্রকাশকে শীঘ্র ফিরিতে বলিলেন।

সুব্রত সেই হোটেলেই একটী কক্ষ লইয়া রহিলেন। শীলার এই সাংঘাতিক পীড়া! আর তাহার জন্যই পীড়া! এই সকল ভাবিয়া তাঁহার অন্তর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল!

শৈলেন একজন 'নর্স' আনিয়া দিলেন ও

---

* মিঃ রায় কোথায়?

† তিনি কল্কা গিয়াছেন; কাল আসিবেন।

‡ রামঠাকুরাণী অত্যন্ত পীড়িতা, তাঁহার রোগ সাংঘাতিক দেখাইতেছে। মিঃ রায়কে কল্যকার ট্রেনে নিশ্চয় আসিবার জন্য আপনার টেলিগ্রাম করা উচিত। আশা করি, ইঁহাকে কেহ দেখিবেন। আমি এখনই আসিতেছি।

নিতে সারারাত্রি সেইখানে থাকিয়া সংবাদাদি লইলেন।

সকালে ট্রেন নাই; বেলা একটায় ট্রেন আসে। ততক্ষণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। শীলার জ্ঞান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার 'ব্রেন ফিভার' বলিয়া জানাইলেন যে, হঠাৎ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া এ পীড়া হইয়াছে। শৈলেন ১০ টার পর কলেজে চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন যে, আবশ্যকতা হইলেই যেন সংবাদ দেয়। সুব্রত তখন বসিবার কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন; শৈলেন চলিয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন।

১টার পরই সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রাম পাইয়াই তাঁহার মন এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি কি ভাবে যে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুব্রতকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এখানে! শীলা কেমন আছে?"

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দোষেই শীলার প্রাণ যেতে বসেছে। আপনার কাছে কি সব বোলবো?"

সুপ্রকাশ। (ব্যস্ত হইয়া) কি বোলবেন? শীগ্‌গির বলুন, আপনি কি করেছেন?

সুব্রত। শীলাকে আপনার সেই 'ভাইভোর্স কেসের' বিষয় জানিয়েছি। আপনি যে তাকে সে কথা না বোলে বিয়ে কোরেছেন, তাই জানিয়েছি। এখনো যে লীলাবতী দাস এখানে আছেন, তাকে যে আপনি অসহায়া বোন, তাও সব জানিয়েছি। আর আপনার আশ্রম ছাড়তে পরামর্শও দিয়েছিলাম। শীলা অন্নদাবাবুর কাছে লক্ষ্ণৌ যাবে বোলে বস্ত্রাদি ঠিক করে নিয়েছিল, আমায় বোলেছিল, আপনি আসলে এই পত্র ও কাগজ দিতে; সেইজন্যে আমি বাধ্য হইয়ে এখানে আছি। শীলা আপনাকে যে পত্র লিখ্‌তেছিল, দেখুন। ডাক্তার-সাহেব আমায় এ দিয়ে গেছেন।

সুপ্রকাশ পত্রখানি হস্তে লইয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি অতিমূর্খের মত কি অন্যায় কোরেছেন! যাক্, এ কথা পরে হবে; শীলাকে আগে দেখে আসি।"

সুব্রত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলেন, এ-সব কিছু নয়? এ-সব কথা কি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? শীলা আমাদের ঘরের বৌ হ'লে, তার পক্ষে কত ভাল হ'ত?"

সুপ্রকাশ অবিচলিত নেত্রে সুব্রতর প্রতি চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মি, বসু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; আপনার কি মনে হয়, আমি এই অপরাধে অপরাধী? ঠিক কোরে বলুন ত!"

সুব্রত তাঁহার সেই নির্দ্দোষ মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "যদি মুখের ভাবে মানুষ চিনতে হয় তা হ'লে, আপনি নির্দ্দোষী; কিন্তু এত যে প্রমাণ?"

সুপ্রকাশ। সে কথা পরে হবে। বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আপনার কি মনে হয়?

সুব্রত। আমার মনে হয় বটে, আপনি নির্দ্দোষ। যদি নির্দ্দোষ হন, আমি আপনার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হব। আপনি আমায় প্রমাণ দেখান, তা হ'লে

আপনার ওপর আমার যে ভার, সব চলে যাবে।

সুপ্রকাশ। দেখাব, এইখানে বসুন। আর দেরী করা নয়। আগে, শীলার জীবন ফিরিয়ে পাই, তবেই নিজের নির্দোষতা প্রমাণ কোর্ব্বো; তা নয় ত নয়।

এই বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুতপদে শীলার কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, তথায় একজন নর্স আছেন এবং আয়াও আছে। তিনি যাইবা-মাত্র নর্স বলিল, "মিঃ রায়, আপনি কথা বল্‌বেন না। রোগী যেন হঠাৎ জেগে না উঠে।" সুপ্রকাশ নর্সের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া তাহার তুষারশুভ্র ললাটদেশ স্পর্শ করিলেন। ললাট জ্বলন্ত-বহ্নিসম উত্তপ্ত। সুপ্রকাশ শয্যার পার্শ্বে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া শীলার দুইটি হস্ত নিজ-হস্ত-মধ্যে ধারণ করিয়া শয্যোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। নর্স ও আয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ সেইস্থানে একমনে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া শীলার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার সেই কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের নিকট বিফলে গেল না। শীলা সুপ্রকাশের স্পর্শে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইতেছিল। সে একবার অন্যদিকে ফিরিল। সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে সেই সুন্দর ললাটদেশে পুনরায় করস্পর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া নর্সকে ডাকিয়া, ডাক্তারকে ডাকিতে বলিলেন।

নর্স ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "She is much better. I hope she will gain her strength soon. Be careful, don't talk too much. Try to keep her quiet." *

সুপ্রকাশ ডাক্তারের সহিত বাহিরে আসিলেন, এবং কি কি করিতে হইবে, সব জানিয়া লইলেন। তাহার পর সুব্রতকে বলিলেন, "আপনি কি এই হোটেলেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ।

সুপ্রকাশ। অনুগ্রহ করে আরও কয়েক দিন থাকুন। আপনার মনের ভাব দূর কোর্ব্বে চেষ্টা কোর্ব্বো।

এমন সময় শৈলেন আসিয়া পড়িলেন। শৈলেন ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সুপ্রকাশ দা, বৌদি কেমন আছেন?"

সুপ্রকাশ। একটু ভাল ত, ডাক্তার বলেন। শৈলেন, তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। এখন মিঃ বসুকে তোমায় আমার সব কথা বোল্‌তে হবে। আমি ভাই, তোমার স্ত্রীর জীবনের জন্যে অনেক দিন ত সহিছি; অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছি।

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া ভয়-চকিত-নেত্রে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) কিন্তু মেসো ত, জান, সব সময়ই আমার ওপর সন্দিগ্ধ, আমার বিষয় কিছু শুন্‌লেই তার রসাতল। সে যদি এ-সব শোনে, তবে সে ত আর বাচ্‌বে না। আমি কি শেষে স্ত্রী-হত্যাকারী হব!

সুপ্রকাশ। এ-দিকে, ভাই, আমার শীলা যে যায়! আমায় কি ভাই, এই বোঝা

* ইনি অনেকটা ভাল। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই ইনি বল লাভ করিবেন। সাবধান, বেশী কথা বলিবেন না। ইহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করুন।

নিয়ে চিরকাল থাকতে বল? তোমার একটু বিবেচনা করা ও উচিত। (সুব্রতর প্রতি) আচ্ছা, মিঃ বসু, আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যা জানবেন তা কাউকেও বলবেন না, শুধু শৈলাকেই বলবেন, তবেই সত্যি কথা শুনতে পাবেন। তা নয় ত, থাক্ আমার ঘাড়ে বলদের বোঝা! কেন মিছে বেচারী শৈলেনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা!

সুব্রত ইহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতেছিলেন। কৌতূহল ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "মাথার আমি শপথ কোরে বলছি যে, আমি আর কাউকেও বোলবো না, আপনি আমায় বলুন। আমিই শৈলার এই দশা করিছি। আমার এ বিষয় জানা নিতান্ত দরকার।

সুপ্রকাশ শৈলেনের প্রতি চাহিলে, শৈলেন অস্পষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু! সে নরকদমা সুপ্রকাশ-দার নামে হয় নি, আমার নামেই হয়েছিল। আমার নাম শৈলেন রায়,—এস, রায়। কাগজে ভুল কোরে 'এস রায় জমীদার', লিখেছিল। মাসীমা যখন এখানে চাওয়া বন্ধ্যাতে আসেন, সুপ্রকাশ-দা তখন এদেশে ছিলেন না; কোলকাতায় জমীদারীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাসীমার কাছে আমিই ছিলাম। তখন আমার বিবাহের এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার সেবার জন্যে আমি মিসেস্ দাসকে নিযুক্ত করি। তিনি মাসীমার কাছে প্রায়ই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নানা কথা বোলতেন যে, তাঁর স্বামী অত্যন্ত নাতাল ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কোন কাজে কাজ নিলেই তাঁকে নানা কথা বলেন, কাজ না করলেও প্রহার করেন ইত্যাদি। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে তিনি মিসেস্ দাসের কাছে টাকা চান। টাকা না পাওয়ায়, তিনি মিসেস দাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করায়, আমি মাসীমার আদেশ-মত চাকর দিয়ে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে বাহির করিয়ে দিই। শেষে সেই অবস্থায় সেই লোক আমাকে মিঃ রায় জমিদার, মনে কোরে, আমার নামে ২৫ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে, আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-ভঙ্গের জন্যে নালিস করেন। পরে আমি টেলিগ্রাম কোরে সুপ্রকাশ-দাকে জানাই। আমার স্ত্রীর দিদিমা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তিনি কেমন কোরে এই সব কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি ব্যস্ত হয়ে এখানে আসেন। তিনি সব জানেন। সুপ্রকাশ-দা যখন দেখলেন যে মিঃ এস রায়-জমীদার, বোলে নালিশ করেছে, তখন হেসে উঠলেন। মাসীমা কিন্তু তাঁকে আদালতে দাঁড়াইতে হয়, তা চাইতেন না। সুপ্রকাশ-দা বল্লেন, 'শৈলেন বেচারির বিয়ের ঠিক্ হয়েছে, তার নামে কথাটা উঠলে, নানারকম গোল হবে; বিয়ে হয় ত হবে না। ওকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দেব। আমার নামে বলে কি হবে? আমি গ্রাহ্য করি না।' তখন সুপ্রকাশ-দা বিয়ে কোরেন না, স্থির করেছিলেন। নরকদমায় দিন ঠিক্ হয়ে গিয়েছিল। হটাৎ তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় মিঃ দাস আমাদের বাড়ীর গেটের পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে, কেমন ভাবে বন্দুক টানেন যে, তা

তাঁর মাথা ভেঙ্গে কোরে চলে যায়। সে কি কাণ্ড!—পুলিশ-এজাহার!—এখনো মনে হলে কি রকম মনে হয়! সুপ্রকাশ-দা আমার জন্যে সব সহ্য করেছেন। আজ, আমার জন্যে তাঁর নির্দ্দোষ নামে এত কলঙ্ক! আজ আমার জন্যে তাঁর স্ত্রী যায় যায়! এ সব শুনলে হয় ত আমার স্ত্রীও বাঁচ্‌বে না।" এইসব বলিতে বলিতে শৈলেন সেইস্থানে বসিয়া দুই হস্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

সুব্রত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি দেবতা; আপনার মত যে মানুষ হয়, তা আমি জানতুম না। পরের জন্যে আপনার এত ত্যাগ-স্বীকার! আপনার পায়ের ধুলো দিন, আমি মাথায় নিয়ে ধন্য হব। শীলাকে আমি এখন নিজের বোনের মতই দেখি, আর দেখ্‌বোও। আপনি আজ থেকে আমার নিজের বড় ভাইয়ের মত হ'লেন। আমায় যা হখন আদেশ কোর্ব্বেন, আমি পালন কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ সুব্রতর প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আগে শীলাকে ফিরিয়ে পাই, নতুবা সব বৃথা হবে। যাই হোক্, এ কথা আর জানাজানি করার অবশ্যকতা নেই; শুধু আপনি নিজে শীলাকে বোল্‌বেন। আপনি এখন এখানেই থাকুন্। আপনি আজ থেকে আমার অতিথি।" তারপর শৈলেনের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "শৈলেন, ওঠ ভাই, তোমার কোনও দোষ নেই। একথা সুষমাকে কেউ বোল্‌বে না। বল্লেও কোন ক্ষতি নেই।"

শৈলেন। (সুব্রতকে) আসুন, আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

তাঁহারা উঠিলেন। এমন সময় আয়া দ্বারের নিকট হইতে বলিল, "হুজুর মেমসাহেব-কো হোস্ আনে পর হুয়া—।"

সুপ্রকাশ দ্রুতপদে আয়ার সহিত চলিয়া গেলেন। সুব্রতকে লইয়া শৈলেন হোটেলের বাহিরে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

অজ্ঞাতাভাস।

মত্ত করি তরু করে দক্ষিণ-দুয়ার,
মলয় বহিছে আজি বসন্ত-সখার
যেন কি সন্দেশ ল'য়ে! নিভৃত-প্রাণের
গোপন মরমতলে কা'র চরণের
মধুর নূপুর বাজে! পুলকে ব্যথায়
চকিতে শিহরি চিত্ত উন্মত্তের প্রায়
করে কা'র অন্বেষণ! উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
ক্ষণে ক্ষণে সারা হৃদি, হারায়ে দু'কূল
অকূলে ভাসিতে চায়! স্বপনের কোলে
বেজে উঠে বাঁশী যেন মদির-হিল্লোলে
কেড়ে লয়ে প্রাণ-মন! অতৃপ্ত যৌবন
মাধবী-পুষ্পের মত বিকশি কেমন,
চেয়ে রয় কা'র করে সঁপি আপনায়
শোভিবে কোমল বক্ষ চুম্বন-মালায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রীতি-উপহার।

তোমাতে আমাতে সখি,
হইলেও ব্যবধান,
তোমারি মধুর স্মৃতি
রহে পূর্ণ সারা প্রাণ।
মরমের তালে তালে
নিরলে নিভৃতে নিতি,
তোমারি রাগিণী বাজে
অবিরত ঢেলে প্রীতি।

এ নব বরষে আজি
লইয়া নবীন আশা,
অরপিছ তব করে
"উপহার ভালবাসা।"
যদিও বা অতিতুচ্ছ
সৌরভ বিহীন ফুল,
তবু আশা,—হৃদি-নভে
দিবে আলো তারা তুল।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ অধ্যায়—আকস্মিক দুর্ঘটনা।

মনুষ্য-জীবনে অনেক সময় অনেক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই দুর্ঘটনাগুলির প্রতিবিধান জানা থাকিলে, তাহা সময়ানুসারে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। মহিলাগণের এ-সকল বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য নিম্নে কতকগুলি দুর্ঘটনার প্রতিবিধান লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

আহত স্থানের চিকিৎসা।

কখনও কখনও বালক-বালিকাদিগের হস্তে ছুরিকা লাগিয়া বা কাচ ফুটিয়া রক্তস্রাব সংঘটিত হয়। এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

(ক) ক্ষতস্থান শীতল জলের দ্বারা ধৌত করিয়া, তাহার ভিতরের ময়লা,—ভগ্ন কাচখণ্ড বা অন্য কোনও পদার্থ, যাহা কিছু থাকে—পরিষ্কার করিয়া দিবে। নতুবা, ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইবে না।

(খ) কর্ত্তিত মুখ-দুইটী নিকটবর্ত্তী করিয়া তাহাতে মলম দিয়া ষ্টিকিং প্লাসটার লাগাইয়া দিবে। ষ্টিকিং প্লাসটারের টুকরা অতিক্ষুদ্র হওয়া চাই।

(গ) ক্ষত স্থান এরূপ-ভাবে রাখিবে, যেন তাহাতে নড়চড় না লাগে। নড়চড় লাগিলেই ক্ষত-মুখটীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ঘটিলে ক্ষত জুড়িতে বিলম্ব হয়।

(১) ধমনীর রক্তস্রাব।—ধমনীর রক্ত দেখিতে উজ্জ্বল, ইহার স্রাব পরিমাণে অধিক হয় এবং নিঃসৃত হইবার কালে বেগে বহির্গত হয়। এবম্বিধ রক্তস্রাব ভয়ানক বিপজ্জনক। স্থূল-ধমনী হইতে যদি রক্তস্রাব হয়, তবে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে রক্তবমনকারী স্থানকে উচ্চে ধারণ করিয়া, তাহার উপর স্থূল বস্ত্রখণ্ড বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ, যাহা সেই সময়ে প্রাপ্ত হইবে, রক্ষা করিয়া, রুমালদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে।

(২) শৈরিক রক্তস্রাব।—কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা শিরা হইতে বহির্গত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রেও স্রাব ক্রমাগত হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকার পূর্ব্বোক্তরূপ।

মূর্চ্ছা।

মস্তকে আঘাত লাগিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইলে, অথবা শরীরের শোণিত উত্তমরূপ অক্সিজেন না পাইলে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়।

(১) রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার মস্তকটী উচ্চে স্থাপন করিবে।

(২) গলার চতুঃপার্শ্বের কাপড় খুলিয়া দিবে।

(৩) রোগীর চতুঃপার্শ্বে বিশুদ্ধ হাওয়া খেলিতে দিবে; এবং

(৪) রোগীকে শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে বা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবে।

মূর্চ্ছা হইলেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া শয়ন করাইয়া শরীরের সমান উচ্চতায় তাহার মস্তকটী রক্ষা করিবে; যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া শোণিত সহজে প্রবাহিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড যখন মস্তিষ্কে রক্ত চালিত করিতে না পারে, তখনই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছাকালে Eau-de-Cologne অথবা নিসাদল নাকের সম্মুখে রাখিতে পারা যায়। কিন্তু মস্তকটী যেন শরীরের সমান উচ্চতায় থাকে,—এ বিষয়ে যেন ভুল না হয়। শীতল জলের ঝাপ্‌টা মুখে দিলেও রোগীর মূর্চ্ছাভঙ্গ ভাল হয়। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাকালে রোগীকে কখনও কিছু খাইতে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জলে ডুবা।*

জল নিমজ্জিত ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থাপনা করিবার চেষ্টা করিবে।

---

* আজকাল জলে ডুবিলে, ডাক্তার সেফারের প্রণালীটিই (Dr. schafer's method) সহজ-সাধ্য ও অধিক ফলদায়ক বোধে অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে জলমগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। রোগীর মুখটী সেবকের পরীক্ষার সুবিধার জন্য, ঈষৎ বাম বা দক্ষিণ দিকে (যে দিকে সেবক বসিবেন, সেই দিকে) ফিরাইয়া রাখা হয়। তাহার পর সেবক তাহার সুবিধামত রোগীর দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রোগীর উভয় পাঁজরের উপর নিজের দুইটী হাত স্থাপন করিয়া, অল্প অল্প চাপ দিয়া তাহা উপরে বগলের কিছু নীচ অবধি উঠান। হাত-দুইটী উপরে উঠাইবার সময় চাপ অল্প অল্প বাড়াইতে হয়; এবং হাত যখন বগলের কাছে আসে, তখন চাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিমিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপ করিলেই যথেষ্ট। এইরূপ করিতে করিতে, কিছুক্ষণ পরে রোগীর নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে এবং তখন তাহার নাকের কাছে হাত দিলেই উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস

(১) তাহার অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া তাহার মুখের আবিলতাকে পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(২) মস্তকের নিম্নে বালিশ রাখিয়া মস্তকটীকে সামান্য উচ্চ করিয়া দিবে।

(৩) রোগীর বাহুদ্বয় (তাহার কনুই-শয়ের নিকট) ধারণ করিয়া, তাহা সোজা উত্তোলিত করিয়া মস্তকের পশ্চাতে লইয়া যাইবে ও পরে মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সেই-দুইটীকে সম্মুখে লইয়া আসিয়া বক্ষে সংলগ্ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়া চারি সেকেণ্ড পরে পরে করিবে; শীঘ্র শীঘ্র করিবে না। এইরূপে কৃত্রিম নিশ্বাস স্থাপিত হইবে। স্বাভাবিক শ্বাস লইতে রোগীর ১৫।২০ মিনিট, এমন কি অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সময়ও লাগে।

(৪) শরীরের উষ্ণতা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য জলনিমজ্জিত ব্যক্তির গাত্রে কম্বলাদি আচ্ছাদিত করিয়া দিবে ও রক্তের গতি নিয়মিত করিবার জন্য শরীর ও পদ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

গলায় জিনিস আটকান।

দুর্ভাগ্য-বশতঃ বালকেরা যদি মটর বা মার্ব্বেল খাইয়া ফেলে ও তাহা গলায় আটকাইয়া যায়, তবে প্রথমতঃ, তাহার গলায় অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বমন করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ফললাভ না হইলে সন্নিকটবর্ত্তী কোনও ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইবে।

যখন বেশ পড়িতে থাকে, তখন উক্ত ব্যাপার ধীরে ধীরে কমাইয়া, ক্রমে থামাইয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণীয়।

হুল-ফুটা।

শরৎকালে বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি প্রায়ই দংশন করে। এরূপ স্থলে হুলটাকে নিষ্কাসিত করিয়া laudanum লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। হুল তুলিয়া লইয়া লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলেও যন্ত্রণা লোপ পায়।

দগ্ধ হওয়া।

দগ্ধ হইয়া যাইলে, স্থানটীর বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া, রেড়ির তেল ও চূণ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া দিবে। চর্ম্মের যে-সকল স্থানে বস্ত্রাদি লাগিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিও না।

(২) সোডা বাই-কার্ব্বের জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া দগ্ধ স্থানে বাঁধিয়া দিবে। ৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পরে ফোস্কাগুলি সূচ-দ্বারা গালিয়া দিয়া, তাহা বসাইয়া দিবে, কিন্তু ফোস্কা উঠাইতে চেষ্টা করিও না। পরে দগ্ধ স্থানটীতে ভেসিলিন লাগাইয়া দিবে।

চক্ষু ও কর্ণে বাহ্য বস্তুর প্রবেশ।

চক্ষে ধূলিকণা পতিত হইলে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল নিঃসৃত হইয়া ধূলিকণা বা উত্তেজক পদার্থকে দূর করিয়া দেয়। যদি পতিত পদার্থ চক্ষে না দেখা যায়, তবে সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষুতে দিয়া কিয়ৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে, যন্ত্রণার উপশম হয়। চক্ষে চূণ পতিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তখন সিরিঞ্জ উত্তমরূপে জল মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিবে। চূণের কণাগুলি অপসারিত হইলে, সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষে দিলে যন্ত্রণার উপশম হইবে।

কর্ণে কোনও বস্তু প্রবেশ করিলে, যদি তাহা অঙ্গুলি-দ্বারা নাগাল না পাওয়া যায়, তবে সোজা দ্বারা তাহা বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান, যেন কর্ণনালায় কোনরূপ আঘাত না লাগে। কারণ, আঘাতের ফল অতিভয়ানক।

কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে ঈষদুষ্ণ জল কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আহত কর্ণটী নীচের দিকে রাখিয়া উপরিস্থিত কর্ণকে চাপড়াইলেই কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু পড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

স্নেহের ব্যথা।

(গল্প)

(১)

করুণার মা মৃত্যুর সময় স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার করুণা যেন কখনও কষ্ট না পায়।" নরেন্দ্রবাবু পত্নীর শেষ অনুরোধটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। করুণা কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সমর্পণ করিয়া অল্পদিন পরেই যখন নরেন্দ্রবাবু পরলোক গমন করিলেন, তখন লোকে বলিল যে, কর্ত্তব্যপালনের জন্যই যেন নরেন্দ্রবাবু এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন; তাই মুক্তি পাইবামাত্র তাঁহার উন্মুখ প্রাণ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

করুণার স্বামী নূতন ডেপুটি হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। করুণা ছেলে-মানুষ, এখনও সংসার করিতে শিখে নাই; তাই সে বিধবা শাশুড়ীর কাছে রহিল। শাশুড়ীর মৃত্যু হওয়ায়, করুণার স্বামী তাহাকে নিজ কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে করুণা স্বামীকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পায় নাই। যখন তাহার কল্পনার দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া সে সবে পূজার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে সেটুকু হইতে বঞ্চিত করিলেন। পনের বছর বয়সে স্বামী হারাইয়া করুণা সংসার অন্ধকার দেখিল। কোথাও আশ্রয় দিবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না। প্রতি-বেশিনীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অধিক কিছু দিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। একজন বলিলেন, "মা, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তোমার অবস্থা জানাও; এখানে বিদেশে একলা মেয়েমানুষ ত থাকতে পারবে না। ঠিকানা দিলে, আমাদের বাবু তোমার আপনার লোকের কাছে টেলিগ্রামও করতে পারেন।"

করুণা অনেক চিন্তা করিয়াও শ্বশুর কিংবা পিতৃকুলের কোনও নিকট আত্মীয়ের কথা স্মরণে আনিতে পারিল না! অবশেষে তাহার মনে হইল যে, তাহার এক মাতুল কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি একটু অধিক সাহেবী-ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহার সহিত করুণাদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। যাহা হউক, এমন বিপদের সময় করুণা তাঁহাকেই

পত্র লেখা স্থির করিল। তিন চারি দিন পরে পত্রের উত্তরে এক টেলিগ্রাম আসিল যে, করুণার মামাতো ভাই যতীন্দ্র তার পরদিনই তাহাকে লইয়া আসিবে। আশ্রয়-লাভের আশা সত্ত্বেও করুণা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রক্তের সম্পর্ক থাকিলেও মাতুল অমরেন্দ্র তাহার নিকট একপ্রকার অপরিচিতই ছিলেন। নিতান্ত ছেলেবেলায় করুণা দুই-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তারপর তাহার বিবাহের সময় তিনি একখানি বহুমূল্য বারাণসী শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে দেখা করিতে আসেন নাই; সহর ছাড়িয়া গেলে কাজের ক্ষতি হয়, এইকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্র সেইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে বাড়ী বসিয়াছিল। সে গিয়া করুণাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। অমরেন্দ্রবাবুর বিশাল ভবনের এককোণে একটুখানি আশ্রয় পাইয়া করুণা বাঁচিল।

ঘোরতর বিষয়ী লোক বলিলে যাহা বুঝায়, মিষ্টার ও মিসেস চ্যাটার্জ্জি, অর্থাৎ অমরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী, তাহাই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা করুণাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুবিধবা—যে সাতেও নাই পাঁচেও নাই, একমুঠা অন্নের পরিবর্ত্তে যে অন্নদাতা আত্মীয়ের সংসারে দাসীপনা করিতে প্রস্তুত,—তাহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত না হইবারই কথা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অবশ্য, করুণাকে কাজ করাইবার জন্য গৃহে আনেন নাই। তাঁহার দাসদাসীর অভাব ছিল না। করুণার জন্য তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই, তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার অল্প একটু দয়াতে যদি অনাথা ভাগিনেয়ীটি একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পায়, তবে মন্দ কি? মাতুলগৃহে আসিয়া করুণা নিতান্ত সুখে না হউক, নিতান্ত দুঃখেও রহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি একটু অধিক সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন; "সাহেব" না বলিয়া কেহ তাঁহাকে "বাবু" বলিলে তিনি বিলক্ষণ চটিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার পুরাদস্তুর সাহেবী রকম ছিল। কিন্তু গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব-আমোদ-গুলি বাদ যাইতে পারিত না। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির এ-সব অনুষ্ঠানে কোনও আপত্তি ছিল না; কারণ, হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প, তাঁহার কোন কালেও ছিল না; তবে, তিনি একটু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, তিনি Reformed Hindu দলের একজন নেতা ছিলেন।

এইসব সাহেবী ধরণ-ধারণের মধ্যে আসিয়া করুণা প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সময় ও অভ্যাসের গুণে সবই সহিয়া যায়; করুণাও ইহাদের আচার-ব্যবহারে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল।

একটা কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। করুণা মুখে মামা, মামী ও দাদা বলিলেও এবাড়ীর লোকের প্রতি বিশেষ একটা প্রাণের টান সে অনুভব করে নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির দশমবর্ষীয়া কন্যা মৃণালিনী বা মনু একমুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়খানি করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। মনুকে

ভালবাসিয়াই সে ক্রমে মামা, মামী, ও যতীন-দাদাকে আপনার জ্ঞান করিতে শিখিল। প্রথম দিন মনু একটু দূরে দূরে ছিল, কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই সে এই নূতন দিদিটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

(২)

করুণা ছেলেবেলা হইতেই একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতেন না, তাই সে কখনও অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু পায় নাই। চিরকুগ্না শাশুড়ীর কাছে থাকিতে, তাঁহার সেবা করিয়াই তাহার সব সময় কাটিয়া যাইত, পাড়ার সমবয়স্কা বৌঝিদের সঙ্গে বিশেষ ভাব করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার পর স্বামীর নিকট যে সামান্য কয় দিন ছিল, তখনও বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিতে পায় নাই।

বাল্যকাল হইতে করুণা বড়ই ভক্তিমতী। যখন সে সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি স্বামীকে দেখিল, তখন তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত তাঁহার পদে লুটাইয়া দিয়া সে কেবল পূজা করিতেই ব্যস্ত রহিল। স্বামীর প্রেমস্পর্শে তাহার প্রণয়-কোরকটী যখন সবে দলগুলি মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিধাতা ঠিক্ সেই সময়ে সেটিকে বৃন্তচ্যুত করিলেন। সন্তানের জননী হইলে, হয় ত, করুণার ভক্তিপ্রেমপূর্ণ চিত্তটি বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত, কিন্তু বিধির বিধানে তাহা ছিল না।

যাহাই হউক, মনুকে পাইয়া করুণার হৃদয়ের সুপ্ত স্নেহরাশি জাগিয়া উঠিল। সে পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও এত ভালবাসে নাই। এই স্নেহোচ্ছ্বাসের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে একদিন মনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি আর জন্মে আমার বোন্ ছিলি মনু?" মনু একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "কেন দিদি? এ জন্মেই ত আমি তোমার বোন্!" করুণা মনে মনে বলিল, "যদি মায়ের পেটের বোন্ হতিস রে, তবে তোকে কেউ দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করত না!"

করুণা কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তাহার মামা-মামী তাহার প্রতি মনুর এতটা টান পছন্দ করিতেছেন না, কারণ, মনু দিদির আদর্শে সাহেবীভাবের বিরোধী হইয়া পিতার শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতেছিল। তাই, তাঁহারা সুবিধা পাইলেই, কোনও ছুতায় মনুকে করুণার নিকট হইতে সরাইয়া লইতেন। এইজন্যই মনুর প্রতি আজ ঐ প্রশ্ন।

একদিন দুপুর-বেলা, করুণা নিজের ঘরটিতে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল এমন সময় তাহার মামী আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। মামীর আগমনে সে একটু বিস্মিত হইল। কারণ, প্রয়োজন হইলে তিনি করুণাকে ডাকিয়া পাঠান, কখনও নিজে তাহার ঘরে আসেন না। বইখানা সরাইয়া রাখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "এই একটু গল্প করতে এলুম।" তাহার পর দুই চারি কথার পর বলিলেন, "দেখ, করুণা, তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমাকে সব বলাই ভাল। ওঁর ইচ্ছে, মনুকে কোন বিলেত-ফেরতের হাতে দেন। ওর শিক্ষাদীক্ষাও সেইরকম ভাবেই দেওয়া হচ্ছে। এখন ও কিন্তু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে ও খুব

ভালবাসে, তা' ত জানই ; সেইজন্যেই, বোধ হয়, পড়াশুনা গান-বাজনায় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।"

করুণা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ত কখনও মন্থুকে পড়া, গান, এ-সব বন্ধ করতে বলি নি। তা-ছাড়া আমি নিজেই ত চাই যে, মন্থু ঐ সব বেশ করে শেখে। আমার জন্যে ওর এ-সব দিকে ক্ষতি হচ্ছে কেমন কোরে, বুঝতে পারলুম না ত মামী-মা ?"

তাহার মামী তখন বলিলেন, "না, না, আমি ত বলি নি যে, তুমি বারণ করেছ। তবে মন্থু থেকে থেকে সব কাজকর্ম্ম ফেলে এসে বলে, 'মা, দিদির কত কষ্ট! আমি ওর সঙ্গে গল্প করলে ও ভাল থাকবে ; আমি যাই, একটু গল্প করি গে।' এই জন্যেই বলছিলুম যে, অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে।"

মন্থুর গভীর প্রীতির কথা শুনিয়া করুণার চোখে জল আসিল, সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "আমাকে কি করতে বলেন, মামী-মা ?" মিসেস চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "আমি বলছিলুম যে, তুমি ওর গল্পপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিও না। ও তোমাকে এত ভালবাসে, তোমারও উচিত নিজের একটু স্বার্থ ত্যাগ কোরে ওর ভাল দেখা। তুমি বুঝিয়ে বল্লেই, মন্থু শুনবে, এই আমার বিশ্বাস। ওর সব খামখেয়ালী চলনে উনি বড় বিরক্ত হন। এই দেখ না, আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মেয়েরা আসেন। সেইজন্যে উনি চান যে, মন্থু জুতা-মোজা পরে থাকে। পরন্তু কিনা সে একেবারে খালি-পায়ে মিসেস স্মিথের সামনে গিয়ে হাজির। উনি যখন বকলেন, তখন আবার বললে 'দিদি ত খালি পায়ে থাকে। এতে কি দোষ ?'" এই সময় মন্থু সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার জননী উঠিলেন।

করুণা মামীর সহানুভূতির অভাবে একটু আঘাত পাইলেও, মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল যে, তিনি তাহাকে নিতান্ত পর মনে করেন না। জোর করিয়া মন্থুকে তাহার নিকট হইতে না সরাইয়া, তিনি যে তাহার সহিত মন খুলিয়া সে-বিষয় কথা বলিলেন, ইহাতে সে অনেকটা আরাম অনুভব করিল। সে মন্থুকে কাছে বসাইয়া বলিল, "মন্থু, তুমি আমার সব কথা শুনবে ?" মন্থু উৎসাহপূর্ব্বক সম্মতি জানাইল। করুণা বলিল, "তুমি আজকাল দুষ্টু মেয়ে হয়ে যাচ্ছ, কেন বল দেখি ? মামীমা বলছিলেন, তুমি মন দিয়ে পড়া-শুনা কর না।" মন্থু করুণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমাকে ছেড়ে মন লাগে না যে দিদি! বাবাকে বোলে আমার পড়ার সময় তোমাকে সেই ঘরে বসিয়ে রাখব, তা হ'লে পড়া হবে।" করুণা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগলী! আমাকে দেখে তোমার মেম শিক্ষয়িত্রী ভাববেন এ একটা জন্তু না কি! আমি কি তাঁর সামনে বেরোতে পারি ভাই!" মন্থু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ইস্ মিসেস্ রো কখনো কিছু মনে করবেন না।" করুণা সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "মন্থু, লক্ষ্মী বোন্টি আমার, তোমার বাবা-মা যা বলেন, তাই শুনে চলো। তাঁদের অসন্তুষ্ট করো না। তুমি ভাল মেয়ে হোলে আমার কত আনন্দ হবে, বল দেখি!" মন্থু সংক্ষেপে "আচ্ছা" বলিয়া করুণার চুল ঘাঁটিতে লাগিল। মন্থুকে কাছে পাইলে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না ; কিন্তু পাছে মামী বিরক্ত হন,

তাই করুণা বলিল, "এবার তুমি যাও, আমার অন্য কাজ আছে।" মনু বলিল, "তোমার আবার কি কাজ? আমাকে তাড়াবার ফন্দি, না?" করুণা হার মানিয়া চুপ করিল।

(৩)

মনু আজকাল বাপ-মায়ের কথামত সব করে। করুণার দেখাদেখি সে মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারই অনুরোধে সে আবার তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম করুণার সময় কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। যে সময়টুকু মনু গান-বাজনা, পড়াশুনা বা চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি লইয়া থাকে, করুণা ততক্ষণ কি করিবে ভাবিয়া পায় না। একদিন সে মাসীকে বলিল, "মাসীমা, শুধু বসে বসে আমার ভাল লাগে না। ভাঁড়ার দেওয়া, খাবার জোগাড় করা, এ-সব চাকরদের হাতে না দিয়ে, আমাকে দিলে ভাল হয়। আপনাদের কি তাতে কোন আপত্তি আছে?" মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, "না, আপত্তি আবার কি? তুমি করলে ত ভালই হয়।" সেই দিন হইতে করুণা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একদিন মনু আসিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার কাছে ঘরসংসারের কাজ শিখ্‌বো।" করুণা তাহার গাল ধরিয়া বলিল, "তোকে এ-সব করতে হবে না। তোর যে একজন মস্ত সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বাড়ীতে কাজ করবার ঢের লোক থাকবে।" মনু রাগ করিয়া বলিল, "আমার বিয়েই হবে না, তা আবার সাহেব!" করুণা হাসিয়া বলিল, "তোর যে তের বছর বয়স হয়েছে, কে বলবে? প্রথম দিন যেমন ছেলে-মানুষটি দেখেছিলুম, আজও তেমনিটিই আছিস্। তোর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল, জানিস্!" মনু বলিল, "তা হোক্। আমার হবে না। বাবা বলেছেন যে, আমার পছন্দমত আমার বিয়ে হবে। তা আমার কিছুতেই কাউকে পছন্দ হবে না।" করুণা বলিল, "আমাদের গুণবতী রাজকন্যার যোগ্যবর, বুঝি, এ ভূভারতে মিলবে না?" মনু তাহার আরক্ত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও,—তাই বুঝি!" তাহার পর হঠাৎ একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমায় ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পার্ব্বো না। তুমি যদি সঙ্গে যাও ত বিয়ে কোর্ব্বো।" করুণা ছল্‌ছল্ চোখে মনুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "ছিঃ, তাকি হয়? মামা থাকতে আমি অন্য জায়গায় যেতে পারি কি? উপায় থাকতে কে আবার পরের গলগ্রহ হয়?" মনু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি তোমার পর, না?" করুণা সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল, "ভগিনীপতিটি ত পর। তিনি ত আর তোমার খাতিরে আমায় ভালবাস্‌বেন না।" মনু বলিল, "তবে আমি বিয়েই কোর্ব্বো না।" করুণা বলিল, "মেয়ে মানুষের কি বিয়ে না করলে চলে, পাগ্‌লী?" মনু বলিল, "আচ্ছা সে কথা থাক্। একটী গল্প বল না, দিদি!"

এই বলিয়া করুণার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। তারপর করুণার একগুচ্ছ চুল সামনে টানিয়া আনিয়া বলিল, "দিদি, তোমার কি সুন্দর চুল! এমন আমি কোথাও দেখি নি। এই চুল তুমি কাটতে চাচ্ছিলে! কি দুষ্টু! কখ্‌খন কাটতে পাবে না। এখন

একটী গল্প বল।" করুণা হাসিয়া বলিল, "যা হুকুম।" তারপর সে সাবিত্রীর উপাখ্যান বলিতে লাগিল।

করুণার গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার মুখের ভাবে, কণ্ঠস্বরে, শ্রোতাকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া যখন সে পৌরাণিক কাহিনীগুলি মনুকে শোনাইত, তখন মনুর মনে হইত, সে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারই বর্ণনা করিতেছে! মনু শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ত ঠিক্ সাবিত্রীর মত সতী; তুমি কেন তোমার স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে না?" করুণা মনুকে বুকে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ছি মনু, ও কথা বলো না। তাঁদের দেবতার অংশে জন্ম ছিল। তাঁরা যা পার্‌তেন, আমরা পাপী মানুষ কি তাই পারি, বোন্!" মনুর চোখেও জল আসিয়াছিল; সে করুণাকে জড়াইয়া বলিল, "দিদি, তুমি পাপী ত, পুণ্যবতী কে?"

(৪)

করুণার হৃদয়ের প্রায় সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা, মনু একাই দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইত, মনুর মত সুন্দর, বুঝি, বিধাতা আর কিছুই গড়েন নাই। মনু বড় হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এ-কথা মনে করিয়া করুণা কষ্ট অনুভব করিত। তখনই আবার লজ্জিত হইয়া মনে করিত, "ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর!" মনু তাহার বুকের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত যেন মিশাইয়াছিল; তাই তাহাকে ছাড়িবার কথা মনে হইলে, করুণার বুক ফাটিয়া যাইত।

এই সময় একদিন মনুর দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই সতীশবাবু সপরিবারে আসিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে অতিথি হইলেন। তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সমস্ত পশ্চিমটা একবার ঘুরিয়া আসিবেন। তাঁহারা মনুকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। মনুর পিতা-মাতা সানন্দে অনুমতি দিলেন। করুণাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মনু দুই একবার "না" বলিয়াছিল, কিন্তু নূতন দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই শেষে জয়ী হইল। মনু তাঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। বিদায়ের দিন করুণা কিছুতেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সতীশবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মা গো, এ আবার কি? মায়ের চেয়েও দেখি যে, এঁর টান বেশী! একমাস মনুকে ছেড়ে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর কি!" করুণা এই কথা শুনিয়া দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া নিজের ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগিল যে, মনু এত সহজেই চলিয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, আহা, ছেলেমানুষ! তাহার কি কোন সাধ থাক্‌বে না? করুণার যেন সংসারে মনু ছাড়া কোন আনন্দ নাই, তাই বলিয়া মনুও কি সব সুখ ছাড়িয়া তাহারই কাছে পড়িয়া থাকিবে?

মনু প্রায় রোজই করুণাকে পত্র লিখিত। করুণা সেগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিত; দিনে শতবার করিয়া সেগুলি পড়িত। দেখিতে দেখিতে একমাস হইয়া গেল। সতীশবাবু লিখিলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটিকে আর কিছুদিন পশ্চিমে রাখিতে পারিলে তাহার শরীরের পক্ষে বড়ই ভাল হয়,—তাই তাঁহারা

তিনমাসের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন; তিন মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবেন। মন্থও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সম্মতি জানাইয়া পত্রের উত্তর দিলেন। করুণা একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া দিন গণিতে লাগিল। করুণা ভাবিল, তিনমাসেই এত কষ্ট! মন্থর বিবাহ হইয়া গেলে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে!

বাস্তবিকই দিন যেন আর কাটে না! তাহার উপর মন্থ আজকাল পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। করুণা ভাবিল, এইবার অভিমান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে; কিন্তু তাহার পর মনে হইল, সেখানে বেড়াইতেই সময় কাটিয়া যায়, তাই বোধ হয়, মন্থ পত্র লিখিতে বেশী সময় পায় না।

তিন মাস পরে যে-দিন মন্থদের আগমন-বার্ত্তা বহন করিয়া একখানি পত্র আসিল, সে-দিন আনন্দে করুণার সব কাজেই ভুল হইতে লাগিল। তাহার পর যখন একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল, এবং মন্থর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তখন করুণার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। স্বাস্থ্যের প্রভায় মন্থর স্বভাবসুন্দর মুখখানি দীপ্ত দেখাইতেছিল। করুণার ইচ্ছা করিতেছিল, শতচুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অত লোকের সাম্‌নে তা কি করা যায়? তাই এই তিন মাসের সঞ্চিত আদরটুকু লইয়া করুণা মন্থকে নিজের মনে পাইবার অপেক্ষায় রহিল।

কেবল তিন মাস,—তার মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন! করুণা দেখিল, মন্থ আর তেমন ভাবে তার সঙ্গে মেশে না। মন্থ সব সময়ই প্রায় সতীশবাবুর স্ত্রীর কাছে থাকিত। করুণা বুঝিতে পারিল না, কি অপরাধে মন্থ এমন পর-পর ব্যবহার করে! করুণা জানিত না যে, সতীশবাবুর স্ত্রী এই অল্প সময়ের মধ্যেই মন্থকে বুঝাইয়াছেন যে, করুণার ভালবাসা কেবল স্বার্থ-প্রণোদিত,—ভবিষ্যতে মন্থর ঘাড়ে চাপিবার ভূমিকা-স্বরূপ। মন্থ একবার বলিয়াছিল, "না বৌদিদি, তা কি হয়?" তাহার এই ক্ষীণ প্রতিবাদটি সতীশবাবুর স্ত্রীর অবজ্ঞার হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে, হয় ত, এত সহজে ভুলিত না, কিন্তু মন্থর প্রকৃতি চিরকালই খামখেয়ালী, তাই তাহার মনে কোন ভাবই গভীরভাবে দাগ দিতে পারিত না। করুণার প্রতি তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, কাজেই তাহাতে আবার শীঘ্রই ভাঁটা ধরিয়া গেল।

সতীশবাবুর একটি শ্যালক সেই বৎসর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল। সতীশবাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা মন্থর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় মন্থর মাতাপিতাকে জানাইলেন। মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইলেন; কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, 'ভাল ছেলে' বলিয়া সতীশবাবুর শ্যালক সুবোধের বেশ সুনাম আছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাহার বুদ্ধি, চরিত্র ও লেখাপড়ার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল; বিলাত হইতে সে খ্যাতি মলিন না হইয়া, উজ্জ্বলতরই হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সুবোধকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য, অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত বিলাত-ফেরত পিতাই উন্মুখ

হইয়া আছেন। বিধাতা এমন রত্নটি অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দান করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারা পুলকিত হইলেন।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "সুবোধকে বাড়ীতে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক্। সে এসে মেয়ে দেখুক্; তারও ত একটা মতামত আছে।" সতীশবাবুর স্ত্রী মন্থুর মাকে বলিলেন, "মন্থুকে দেখে তার আর মত না হয়ে যায় না। অমন মেয়ে সে আর পাবে কোথায়?" কন্যার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বৌমা, তুমি দিন কয়েক থেকে যাও। তুমি থাকতে থাকতেই সুবোধ এলে, শীঘ্রিই তার লজ্জা ভেঙে যাবে।"

করুণা সকলই শুনিল। সুপাত্রের সহিত মন্থুর বিবাহের আয়োজনে তাহার খুব আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, তাহার মনের এককোণে একটু ব্যথা লুকাইয়া রহিল।

সুবোধের সম্পূর্ণ মত জানিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সেই মাসের শেষেই মন্থুর বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে সুবোধ এক-এক-দিন দেখা করিতে আসিত। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণার সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করুণা রাজি হয় নাই। সে আড়াল হইতে সুবোধের স্মিত-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিত, "মন্থু যেন সুখী হয়।" একদিন সে মন্থুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্থু, বর দেখেছিস্ ত? কেমন? পছন্দ হয়?" মন্থু, "যাও" বলিয়া পলাইয়া গেল। মন্থুর সলজ্জ অথচ আনন্দপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা বুঝিল যে, মন্থু সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে উভয়ের কল্যাণকামনা করিয়া সে কার্য্যান্তরে গেল।

(৫)

বিবাহের আর দুই দিন বাকী। কাজের গোলমালে করুণা একরকম আছে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর দুই দিন পরে মন্থু চলিয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কি তাহাকে আঁকড়াইয়া রাখিবার অধিকার করুণা পায় না? করুণা ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর আপনার স্বার্থপর ভালবাসার জন্য নিজেকে শতবার ধিক্কার দিল, কিন্তু তবুও যে মন মানে না! করুণা স্বামীর ছবিখানি বাহির করিল। অশ্রুজলে ভাল করিয়া স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, মন্থুকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া সে বুঝি, স্বামীকেও ভুলিতে বসিয়াছে। সে তাঁহাকে গভীর ভক্তি দিয়াছিল বটে, তবে এমন করিয়া বুঝি, তাঁহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই! চোখের জল মুছিয়া ছবিখানা মাথায় ঠেকাইয়া করুণা আপন মনে বলিল, "ওগো, দাসীকে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাও। আমি যে এখানে থাকতে পারি না। কেমন কোরে আমি সব ছেড়ে বেঁচে থাকব?" আবার তাহার দু'চোখ হ'তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই সময়ে সতীশবাবুর স্ত্রী তথায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি করুণার ঘরে ঢুকিয়া, তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন; মন্থুর কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমার বিদি না, তোমায় বড় ভালবাসে। এই শুভকর্ম্মের

সময় কি-না, ঘরের কোণে বসে চোখের জল ফেলা হচ্ছে! আসলে, তোমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে, তাই সহ্য হচ্ছে না।" মনু মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেলে মনু শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি কন্যাজামাতাকে আবার লইয়া আসিলেন। যে কয়দিন মনু ছিল না, করুণা সে কয়দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটাইয়াছিল। প্রথম প্রথম ত একেবারে ঘুমাইতে পারিত না; বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ডাকিত, "মনু, মনু আমার! আমাকে তোর কাছে নিয়ে যা! আমার অত মান-অপমান দিয়ে কি হবে? আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারি না যে!" নিজের এই ভালবাসার আবেগ দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত। প্রণয়ীদের মধ্যেই ত এমন ভালবাসার কথা উপন্যাসে পড়া যায়! মনুকে সে কেন এমন ভালবাসে? প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে করুণা প্রার্থনা করিত, "হরি, আমায় শান্তি দাও।"

এবার সুবোধের সহিত করুণার আলাপ হইল। তবে করুণা তাহার সহিত বড় একটা কথা বলিত না। একদিন সুবোধ মনুকে বলিল, "মৃণাল, তোমার দিদিকে ডাক না, একটু গল্প করা যাক্। তোমার দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একখানি দেবীপ্রতিমা।" মনু, বোধ হয়, কথাটা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইল; বলিল, "এখন আর ডাকতে পারি না। সে হয় ত, কাজ করছে।" এই সময় করুণা তাহাদের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি, একটু আসুন না; মৃণাল আপনাকে ডাকছে।"

করুণার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার অযত্নবর্দ্ধিত জটাবদ্ধ উন্মুক্ত কেশরাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; সত্য-সত্যই তাহাকে একখানি দেবীপ্রতিমার ন্যায়ই দেখাইতেছিল। সে সুবোধকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

সুবোধ এত বড় হইয়াও স্বভাবের সরলতা হারায় নাই; সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "দিদি, আপনার কি সুন্দর চুল; ঠিক্ ঝগড়াটীর মতন।" করুণা লজ্জিত হইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। সুবোধের আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছ মনু?" মনু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি ডাকি নি। উনি মিথ্যা কথা বলেছেন।" সুবোধ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতেও মনুর মুখের অপ্রসন্নতা দূর হইল না দেখিয়া, "আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসি," বলিয়া করুণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সে শুনিতে পাইল, মনু সুবোধকে বলিতেছে, "তুমি বিধবাদের চুল রাখা পছন্দ কর? আমি ত দু'চক্ষে ও-সব দেখ্‌তে পারি না;—তা আবার লোক-দেখানর জন্যে খুলে বেড়ান!"

করুণার বক্ষের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইল; সে কোনমতে আপনাকে সাম্‌লাইয়া চলিয়া গেল! সুবোধ যে বলিল, "ছিঃ, মৃণাল, তোমার দিদি দেবী, তাঁর বিষয় অমনি করে বলা উচিত নয়।" এবং তাহার উত্তরে মনু যে বলিল, "আমি এতদিনে যা না চিনতে পেরেছি, তুমি দেখ্‌ছি দু'দিনে তাই

চিনে ফেলেছ।" এসব কথা আর করুণার কানে পৌঁছিল না। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে জলও আসিল না। সতীশবাবুর স্ত্রীর শত গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু মনু! যে মনু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া বিবাহ করিতেও অসম্মত ছিল, সে কেমন করিয়া এমন হইল! অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে করুণার মনে পড়িতে লাগিল। মনুই তাহাকে চুল কাটিতে দিবে না বলিয়াছিল! মনু ভালবাসিত বলিয়াই না চুলের প্রতি তাহার মায়া! সেই মনু অমন করিয়া বলিল! করুণা বুঝিতে পারিল না, মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হয়। বাক্স হইতে কাঁচিখানি বাহির করিয়া সে তাহার আগুল্ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল! দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মনু, মনু!" বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, স্বামীর উদ্দেশে ভক্তি-অবনত-চিত্তে মাথাটি নত করিল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি করুণা, তুমি চুল কাট্‌লে কেন?" করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "অনেক দিন থেকেই কাট্‌ব কাট্‌ব ভাবছি মামীমা! যে গরম পড়েছে, আর সহ্য হয় না। কি বা হবে চুল দিয়ে!" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আর কিছু বলিলেন না।

সে-দিন রাত্রে যখন করুণা মনুকে খাইতে ডাকিতে গেল, তখন তাহার মুখে বিষাদের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সে মনুর আশ্চর্য্যভাব কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে ডাকিল, "মনু, খাবে এস।"

এতদিন পরে ঠাকুর করুণার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যথিত হৃদয়খানি দেবতার করুণায় আজ শান্তিলাভ করিয়াছে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

নমিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিলেও কৌতূহলী সুশীলের আগ্রহ অসংবরণীয়। সুতরাং তাহার রসনা দ্রুততালে সশব্দে সঞ্চালিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। "পত্র কে লিখিয়াছেন? কেন লিখিয়াছেন? কি প্রয়োজন?" সুশীলের ইত্যাকার প্রশ্নের উপর্যুপরি বর্ষণে বিব্রত হইয়া, নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল। মাত্র চারি ছত্রে সমাপ্ত ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি :—

"মাননীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আপনার

কাছে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সহৃদয়তা-গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সুবিধা-মত যে-কোনও সময়ে একবার এ বাটীতে আসিয়া পায়ের ধুলা দিলে, বড়ই উপকৃতা হইব। ইতি—

নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া—
শ্রীসরমা মিত্র।"

চমৎকৃতা নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—সরমা মিত্র!—নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে অধীর সুশীল, নমিতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, পত্রখানার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া, অবশেষে ডাকিল, "দিদি!"

পত্রের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তামগ্না নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল! পরক্ষণেই হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, অস্বাভাবিক অপ্রসন্নতার সহিত রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঢের বেলা হয়েছে; আর বাজে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা নয়। শীগ্‌গী তেল নিয়ে আয়, মাখিয়ে দেব।" সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, বিনা-বাক্যে সে দিদির আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। দিদির প্রতীক্ষায় এখনও সে স্নান করে নাই।

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্মনা নমিতা চিন্তাকুল বদনে, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। তাহার পর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া, পরিত্যক্ত পত্রখানার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পত্রখানা, ক্ষুদ্র পত্র। কিন্তু নমিতার মনের উপর এটা যে আশ্চর্য্য প্রহেলিকার তীব্র ঝাপ্টা হানিয়াছে! উপর-ওয়ালার তীব্র আহ্বান! "বিশেষ প্রয়োজন"—ইহার অর্থ কি? নমিতার পক্ষে ইহা যে বড় বিষম অদ্ভুত ঠেকিতেছে! এ ভাষা যতই মার্জ্জিত ও কোমল হউক্, কিন্তু কে জানে, ইহার অভ্যন্তরে কোন্ জটিলতা অবস্থান করিতেছে! এ 'প্রয়োজনের' উদ্দেশ্য কি? ইহা অনুগ্রহের লাঞ্ছনা, না, দণ্ডের পরিহাস?

নমিতার মস্তকের রক্তস্রোত ঝিম্ ঝিম্-শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—একসঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা-স্মৃতি চিত্তপটে উদিত হইল; ডাক্তার মিত্রের আচার-ব্যবহারের অতিরঞ্জিত প্রত্যক্ষ বিবরণের চৌহদ্দীগুলা, স্মৃতির দ্বারে উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—চিত্ত সবেগে বক্র হইয়া উঠিল; অস্থির-ভাবে নমিতা কক্ষের বাহিরে চলিয়া আসিল।

অন্য দিনের অপেক্ষা বেশী শীঘ্র ও সংক্ষেপে পীড়িত বালকের তত্ত্ব শুধাইয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া নমিতা শয়ন কক্ষে আসিল। পত্রখানা তখনও করুণ অনুনয়ের অক্ষরমালা বুকে করিয়া নিস্পন্দভাবে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; নমিতা বিরক্তভাবে তৎ-প্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইল। খোলা জানালার রৌদ্রের সন্নিধানে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে সেই চিকিৎসা-পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। আর্দ্র কেশরাশি আধ-ঘণ্টার মধ্যে রৌদ্রে শুখাইয়া লইতে হইবে; তাহার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া 'ডিউটী' খাটার দায়ে নিশ্চিন্ত হইবে।

নমিতা বই পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠ্য-বিষয়ে তাহার চিত্ত আদৌ নিবদ্ধ হইল

না। মনের কোণটায় কি যেন একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্যের বেদনা ক্রমাগতই খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সকলের সহিতই চিরদিন সে সরল বিশ্বাসে সখ্য-সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। এখন দিনে দিনে তাহার সুস্থ সরলতার সুদৃঢ় বুকে, উদ্দাম বেদনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে, দুঃখের ভয় ধরিয়াছে,—এখন পরিচিত অপরিচিত, সকলের পানেই হঠাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে তাহার শঙ্কা হয়, সন্দেহ হয়;—মনের মধ্যে রুদ্ধ ব্যাকুলতা অজ্ঞাত উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠে! ...এ বড় অস্বস্তিকর ক্লেশ!

ঢুলটা আধ্ শুকনা হইবার পূর্ব্বেই নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া চক্ষু বুজিল; কিন্তু চক্ষু বোজানই সার হইল মাত্র; ঘুম হইল না। মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ চতুর্গুণ ঘেনাইয়া, তাহার বাহ্য-প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঘুমের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া, নমিতা গা-ঝাড়া দিল। কক্ষমধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করিয়া, অন্যমনস্কভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও পত্রখানা তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সুষমা মিত্র,—অর্থাৎ ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! তা হউক; তবু ত তিনি নির্ম্মলবাবুর ভাতৃজায়া! আশ্চর্য্য রহস্য! সেই শিশুর মত সরল-স্নেহ-শ্রীমণ্ডিত সুন্দর যুবকের ইনি সম্মানস্থানীয়া সম্পর্কীয়া রমণী!

অজ্ঞাত কৌতূহলে ধীরে ধীরে নমিতার মন আগ্রহোন্মুখ হইয়া উঠিল!.....ইনি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কটিকে 'বড়' করিয়া, ইঁহার অজ্ঞাত 'প্রয়োজন'টাকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেচ্ছভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আত্ম-মানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। কে বলিতে পারে, ইঁহার মধ্যে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব নাই? কে জানে, ইনি সংসারের নিকট 'কায়ার ছায়া'-রূপে প্রতিপন্ন হইলেও, ভিন্ন-ধাতু-গঠিতা জীবন্ত-প্রাণ-বিশিষ্টা রমণী নহেন? কে জানে, ইনি কি শুধু সদা-বিক্ষিপ্ত-চেতা ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী—কি সরলস্বভাব প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক নির্ম্মলবাবুর ভাতৃজায়া ও বটেন!

দূর হউক, অবস্থা-চক্রের উৎপীড়নে নিজের দুঃখ-দ্বন্দ্বের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নমিতা মূর্খ দৌর্ব্বল্যে এমন শিষ্ট সংযত প্রীতির আহ্বানকে কঠিন ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া, শুষ্ক রূঢ়তার আশ্রয়ে আত্ম-মর্য্যাদার নামে আত্ম শ্লাঘার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছলনা করিবে না! হউক্ অসম্মান; ইনি যাহা ভাবিয়া যে উদ্দেশ্যেই ডাকিয়া থাকুন, নমিতা কেন কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে? বাহ্যিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে কেন অনর্থক অভ্যন্তরটা তীব্র অস্বস্তির বিষ-বাষ্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে? এ কি মতিচ্ছন্ন!

অসময়ে সদ্যঃ-স্কুল-প্রত্যাগতা সমিতা আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কক্ষে ঢুকিয়া উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, ভাই, আজ আমাদের এগ্‌জামিনের খবর বেরুলো; আমি এবার ফার্ষ্ট হয়ে পাশে উঠেছি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক, ৩০ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 646. June, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৬ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। জুন, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

মিলনে।

সে-দিন প্রভাত-বেলা
ত্যেয়াগি' শয়ন,
তোরণ-দুয়ার খুলি',
দেখিনু নয়ন মেলি',
সে শান্ত মূরতি তব,
প্রিয়-দরশন!

মোহন-তুলিকা তব
নয়নে আমার
সাদরে বুলায়ে দিলে,
সব দুঃখ লু'টে নিলে!—
দেখিনু হৃদয় মাঝে
স্বরূপ তোমার!

তোমারে পূজিতে নাথ,
কত আকিঞ্চন!
নিমেষে সকল ভুলি',
লইনু হৃদয়ে তুলি',
করিনু আদর কত
ওগো প্রাণধন!

সে-দিন সে মধুপ্রাতে
আঁচল ভরিয়া
কুড়া'য়ে বকুল জাতি,
সাধের মালাটী গাঁথি'
আনিনু পরাতে গলে
যতন করিয়া!

হাসিয়ে অমনি গলে
চুমিলে আমারে;
আমারে আপন জানি
বুকে নাথ, নিলে টানি',
চির-বাঞ্ছিতের মত
কি সোহাগ ভরে!

বিফল হৃদয় মাঝে
হে জীবন-স্বামী!
আশার আলোক-রেখা
ধীরে ধীরে দিল দেখা;
আঁধার কোথায় গেল
নীরবেতে নামি'!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২৬)

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, শীলার মুখের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছে। সে শয্যায় শুইয়া এ-ধার ও-ধার করিতেছে। সুপ্রকাশ নিকটে গিয়া শীলার সেই শুভ্র ললাটে কর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ললাট অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল। তিনি তাহার করস্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "শীলা! শীলা আমার!" শীলা সেই করস্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি কখন এলে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" সুপ্রকাশ তাহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "এখন কেমন আছ, শীলা?"

শীলা। কেন, আমার কি হয়েছে? মাথা-টার মধ্যে বড় বেদনা। আমি কি অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি?—রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম।

সুপ্রকাশ সে কথায় উত্তর না দিয়া 'নর্শ'কে ডাকিলেন ও শীলাকে একটু দুগ্ধ দিতে বলিলেন। শীলা বিস্মিতভাবে নর্শের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কে? এ আমায় কেন দুধ দিচ্ছে?"

সুপ্রকাশ। আজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তোমায় ফিরিয়ে পেয়েছি। তোমার ভয়ানক অসুখ করেছিল! এখনো তোমায় অতিসাবধানে থাকতে হবে। বেশী কথা বোলো না; ডাক্তার-সাহেব নিষেধ করেছেন।

শীলা বিস্মিতভাবে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুপ্রকাশ দুই-একটী কথার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * *

এদিকে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সুব্রত বলিলেন, "এখন কোথায় যাচ্ছেন?"

শৈলেন। আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।

তাঁহারা দ্রুত-পদে পথ-সকল অতিক্রম করিয়া সহরের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শৈলেন সুব্রতকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিতে, সুব্রতও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—একটি সুন্দর মৃত্তিকালিপ্ত অঙ্গন; তাহার মধ্যস্থলে একখানি দড়ির খাটিয়াতে একজন বৃদ্ধা শয়ন করিয়া আছেন; তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত। শৈলেন সেই স্থানে ডাকিলেন,—"মিসেস্ দাস!" দুই-চারিবার আহ্বানের পরেই ভ্রমরকৃষ্ণবিনিন্দিত-কান্তি আরব্ধবার্দ্ধক্যা একটী নারী বাহিরে আসিলেন; তাঁহার ললাটদেশে একটি গভীর কাটার চিহ্ন; বেশভূষা এতদ্দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোকদের ন্যায়। তিনি আসিয়াই শৈলেন রায়কে সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করিলেন। শৈলেন হাসিয়া সুব্রতর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিঃ বসু! মিসেস্ লীলাবতী দাস।" সুব্রত দুই-এক পদ পিছাইয়া গেলেন।

মিসেস্ দাস বলিলেন, "আমায় কি বল্‌ছেন ?"

শৈলেন। মিঃ রায় সম্প্রতি বিবাহ করেছেন, তা আপ্‌নি বোধ হয়, জানেন। ইনি সম্প্রতি এসে সেই মকদ্দমার কথা-সব মিঃ রায়ের স্ত্রীকে বলেছেন। তিনি এ-সকল কিছুই জান্‌তেন না; হঠাৎ এই কথা শুনেই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা এঁকে সকল কথা বলিছি, আর আপ্‌নার কাছে এনেছি। এঁরা কাগজের কথাই বিশ্বাস কোরেছেন।

মিসেস্ দাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মিঃ রায় আমাদের জীবন-দাতা। তাঁর দয়াতেই আমরা আজ জীবন ধারণ কোরে আছি। আমার এই বৃদ্ধা মাতার ও দুটি সন্তানের ভরণ পোষণের ভার আমার উপর। আমার চাকুরী যাবার পর থেকেই মিঃ রায় আমায় ২০টি টাকা মাসহারা দেন; তাতেই আমার কোন প্রকারে চল্‌ছে। যা সামান্য একটু কাজ কোর্ত্তে পার্‌তাম, আমার মায়ের এই অবস্থার জন্যে, তাও কিছুই কর্‌তে পার্‌ছি না।

শৈলেন। মিসেস্ দাস, আপনার ললাটের ঐ চিহ্নের বিষয় মিঃ বসুকে একটু বলুন।

মিসেস্ দাস। এটি আমার সুকৃতির ফল। সে-দিন যদি আপ্‌নি আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় রক্ষা না কর্‌তেন, তা হলে আমার ইহলীলা সাঙ্গ হ'ত। আমার মোলেই ভাল ছিল। তবে, দুটি শিশু! তাদের জন্যেই ভগবান্, বুঝি, আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন দেখ্‌ছি। যখন সকল কথা স্মরণ হয়, সর্ব্বাশয় মিঃ রায়ের উপর কলঙ্কের কথা যখন মনে করি, তখন জীবনে ঘৃণা আসে। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা সাহোদরার বয়সী, তাঁর মায়ের সমান। আর কি বল্‌ব? আপ্‌নি ত সবই জানেন।"

সুব্রত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে সুপ্রকাশ রায়ের প্রতি তাহার যে ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল, ক্রমে তাহা যেন চলিয়া যাইতে-ছিল! বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা-ভালবাসা যেন মিঃ রায়ের প্রতি ধাবিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে আসিতে আসিতে সুব্রত বলিলেন, "আপ্‌নি আপ্‌নার স্ত্রীকে সব কথা বলেন না কেন?"

শৈলেন। আমার স্ত্রীর স্বভাব অন্য-রকম। বিলেতে যখন ছিলাম, তখন আমার নামে উপহাস কোরে আমার এক বন্ধু কি লিখেছিল; তা শুনেই ত তিনি শয্যাগত হয়ে যান-যান হয়েছিলেন, আর আমাকে বিবাহ কোর্ব্বেন্ না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিবাহের পরেও দেখ্‌ছি, বড়ই সন্দিগ্ধ-মন; একটু উত্তেজিত হ'লেই সর্ব্বনাশ হবে। আমার দিদি-শাশুড়ী সব জানেন; তিনি বারবার কোরে আমায় তা'র কাছে কোন কথা বল্‌তে মানা কোরেছেন। ছেলেটির মৃত্যুর পর থেকে তার 'হার্ট' অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে; ডাক্তারেরা বোলেছেন, একটু উত্তেজনায় সাংঘাতিক ফল হ'তে পারে।

শৈলেন রায়ের কথায় ও মিসেস্ দাসকে দেখিয়া সুব্রতর মনের ভাব অন্যপ্রকার হইয়া গেল। সুপ্রকাশের চরিত্র তাঁহার চক্ষে আদর্শ-চরিত্র মনে হইল। পরের জন্য কে এত ত্যাগ-স্বীকার করে! নিজের নিষ্কলঙ্ক

চরিত্রে কে কলঙ্ক অর্পণ করে! তিনি স্থির করিলেন, সুপ্রকাশ রায়ের নিকট গিয়া বিশেষ-ভাবে ক্ষমা চাহিবেন।

যখন সুব্রত ও শৈলেন হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সুপ্রকাশ বসিবার কক্ষেই ছিলেন। সুব্রত গিয়াই তাঁহার নিকট, দুঃখিত অন্তরে, অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে, বিনীত বচনে বলিলেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন। আপ্‌নার উপর আমি বিশেষ অবিচার কোরেছি।"

সুপ্রকাশ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "না, আপ্‌নি কোনও অবিচার করেন নি। আপনারই ত সঙ্গে শীলার বিবাহ হ'বার কথা হচ্ছিল; আমি মাঝ্‌ থেকে এসে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হয়িছি। আমার সঙ্গে শীলার বিয়ে হ'লে, আমি যে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হ'ব, তা আমি জান্‌তুম; সেইজন্যে আমি শীলার কাছ থেকে দূরে-দূরেই থাক্‌তুম। শীলা যদি আমায় ভাল না বাসত, তা হ'লে আমি কখনও কোনও দিন আপ্‌নার পথের সম্মুখে আস্‌তুম না।"

সুব্রত। সে যাই হোক্‌, আমি যদি এই সব সংবাদ না জানাতাম, তা হ'লে মিসেস্‌ রায় এ-রকম সাংঘাতিক-ভাবে পীড়িত হ'তেন না। আমি এজন্যে বড়ই অনুতপ্ত।

সুপ্রকাশ। বড়ই সৌভাগ্য যে, শীলার জ্ঞান হ'য়েছে। সে এ-সব কথা ভুলে গিয়েছে। তবে, ক্রমেই সব তার মনে পড়্‌বে। আমার একান্ত অনুরোধ, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, আপ্‌নি এখানে থাকুন্‌। তা হ'লে শীলা আপ্‌নার কাছ থেকেই সব শুন্‌বে।

সুব্রত। আপ্‌নি আমাকে যা বোল্‌বেন, আমি তাই কোর্ব্বো।

সুপ্রকাশ। আমার বড় সৌভাগ্য, এই পরীক্ষার মধ্যেও জগদীশ্বরের কৃপায় আপ্‌নাকে সুহৃদ্‌ পেলাম।

সুব্রত করমর্দ্দনার্থ স্বকীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমাকে আপনার নিজের ভাই বোলেই জান্‌বেন, এই আমার অনুরোধ!"

সুপ্রকাশ দৃঢ়-মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তাই হোক্‌। তুমি আমার ছোট-ভাই হ'লে। আশা করি, আমাদের এ-প্রকার মনের ভাব চিরস্থায়ী হ'বে।"

শৈলেন বিদায় লইয়া বিষণ্ণ-মনে বাটীভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আহা! যদি সুষমা সব বুঝিত, যদি সুষমাকে সব বলা যাইত, তাহা হইলে আজিকার দিন কত সুখের হইত!—আমাদিগের অবস্থা কি সুখময়ী হইত! একত্রে জীবন যাপন করিয়াও, আজ সে আমার হৃদয় অজ্ঞাত বলিয়া, আমাদিগের পরস্পরের অবোধ-জনিত কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তাহার ও আমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে! আমি আজ তাহার নিকটে থাকিয়াও কত দূরে! শারীরিক সান্নিধ্য কি করিতে পারে? মনের সহিত মনের সংযোগই, দূরত্বের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া, দুইটী হৃদয়কে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া নৈকট্য সম্পাদন করে। পরস্পরের জীবন পরস্পরের হৃদয়ে স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিলে, সে জীবন-দ্বয়ের মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরের ব্যবধান থাকিলেও, তাহারা পরস্পরের অতিনিকটেই বাস করে! মৃত্যুর পরপারেও তাহাদিগের এই প্রীতির সংযোগ কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না!"

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা তাঁহারই জন্য পথ চাহিয়া আছে। তিনি যাইবামাত্রই সে তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বলিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

সুপ্রকাশ। এখানেই ছিলাম। ডাক্তার যে বেশী কথা বোল্‌তে তোমায় বারণ কোরেছেন।

শীলা। তুমি আমার কাছেই থাক। দূরে গেলে আমার বড় ভয় করে; কেবলই মনে হয়, আর বুঝি, দেখা হ'বে না!

সুপ্রকাশ। তোমায় ছেড়ে কি আমি স্থির থাক্‌তে পারি? শীলা! তুমি শিগ্‌গির সেরে ওঠ, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

শীলা। আমি তো বেশ ভাল আছি। আর কোথাও যাব না। এবার কটকেই চল।

সুপ্রকাশ। সেই ভাল। সেখানে বেশ দু'জনে নির্জ্জনে থাক্‌ব। আমি তোমার কাকাকে লিখে দেব।

শীলা। অমির খুব আহ্লাদ হবে। আবার তেমনি কোরে বোটে কোরে বেড়াতে যাবে; কেমন? সেই নদীর ধার আমার বড় ভাল লাগে। সেই সেখানে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম! তোমায় দেখে পর্য্যন্ত কেবল তোমার মুখই চোখের সামনে দেখ্‌তাম; ঘুমোলে তোমায় স্বপ্ন দেখ্‌তাম; তুমি আমায় যাদু করেছিলে!

সুপ্রকাশ শীলার ললাটের কেশরাশি সস্নেহে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর তুমি! যে-আমি কখনও কারো দিকে ফিরে চাই নি, সেই আমি তোমায় প্রথম দেখেই যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম! কিন্তু সত্যি, তখন মনে করি নি যে, তুমি আমার হবে! সুব্রত—।"

শীলা। (ব্যস্তভাবে) আবার ও-সব নাম কেন? আমার তাঁর নামে ভয়ানক ভয় করে; আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তিনি এসে জোর কোরে আমায় তোমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে, দূরে ফেলে দিচ্ছেন।

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আহা, বেচারা সুব্রত! সে নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ভালবেসেছিল। তা'র নামে ভয় পেও না। কারো সাধ্য নেই, আমাদের ভিন্ন করে। ঈশ্বরের এ বন্ধন কেউ ছিন্ন কর্‌তে পারে না।

শীলা। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, সুব্রত এখানে এসেছেন। আমার সে কথা মনে হলে, ভয় করে।

সুপ্রকাশ। ও সব কথা ভুলে যাও; না হ'লে, আমি চলে যাই। ডাক্তার তোমাকে বেশী কথা বল্‌তে মানা করেছেন। তোমার 'ব্রেন-ফিবার' হয়েছিল। শান্ত হ'য়ে থাক। আর একটু ভাল হও, তখন স্বপ্নের কথা বোলো। আমি তো স্বপ্ন নই; আমি কাছে আছি। দেখ, আমি স্বপ্ন কি-না?

এই বলিয়া সুপ্রকাশ শীলার হস্ত স্পর্শ করিলেন।

শীলা। আচ্ছা, আমি কথা কইব না; কিন্তু তুমি আমার কাছে থাক। না, তুমি একটী গান কর। ওই পাশের ঘরে বাজনা আছে। এই দরজা খুলে দাও, আর গান কর; আমি শুন্‌ব। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি। গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমিও তা হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌ব।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে গমন

করিলেন ও পিয়ানোতে হাত দিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে গাহিলেন—

"যখন তুমি ছিলে দূরে,
দাও নি মোরে দেখা;
সে-সব দিনের কথা-ব্যথা
সব সয়েছি একা।
পলে পলে দিনে দিনে,
গেঁথে তুলে স্মৃতির সনে,
মনের দুঃখে চোকের জলে
হার করেছি তার;
প্রতিদিনের কথা যেন
হার সে মুকুতার!
কবে কোথায় হেসেছিলে,
যেতে যেতে চেয়েছিলে,
কবে কখন তোমার চোকে
ছিল প্রণয়-লেখা;
তাই সে সকল কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবছি বসে একা!
কভু হৃদয় আশায় হাসে,
কভু নয়ন জলে ভাসে,
সেই ব্যথার দুঃখের মাঝে
কেবল বার-বার
চোকের জলে গেঁথেছি এ
মুকুতার হার!"

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে এই গানটী গাহিলেন। শীলার হৃদয় যেন অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল! তাহার রোগশ্রান্ত নয়ন-দুইটি আপনিই মুদ্রিত হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

গান শেষ করিয়া যখন সুপ্রকাশ শীলার শয্যাপ্রান্তে আসিলেন, দেখিলেন, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেই রোগশীর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, শীলা ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেই বসিয়াছিল। জগদীশ্বরের অসীম করুণায় তিনি যে আবার তাহাকে পাইয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল ও দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

হতাশের গান।

তোমারি তরেতে জ্বলিছে দেহ,
তোমারি তরেতে পুড়িছে প্রাণ;
তোমারি জ্বালায় আঁখি বরষায়,
বাহির হয়েও হয় না, 'জ্ঞান'!
যদিও এ দেহ অক্ষম দুর্ব্বল,—
তোমারি তরেতে খাটিছে;
যদিও এ হস্ত রোগেতে মলিন,—
তোমারি গহনা আনিছে!
যদিও মাহিনা এত কম, তা'তে
কিছুই তোমার হয় না;—
তবুও প্রেয়সি, দিই তা আনিয়া,
কানাকড়িখানি নিজে না রাখিয়া!
যদি হাসি ফুটে, ও অধর-পুটে
এই আশে করি সকলি দান,
(তবু, এমনি কপাল, অভাগার হায়,
ভেঙেও ভাঙে না ও পোড়া মান!)

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার অব্যবহিত-পূর্ব্বে ৺বিশ্বেশ্বর-দর্শন-মানসে একটী এক্কা ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। এ অদ্ভুত যান বঙ্গদেশে অতিশয় বিরল। পূর্ব্বে ইহার নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র; আজ আরোহণে কৃতার্থ হইলাম। শীর্ণাবয়ব অশ্ববর, ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ বস্ত্র-পরিহিত চালক, মলিন-কন্থা-সমাচ্ছাদিত উপবেশনের স্থান, ইত্যাদি দেখিয়া প্রথমে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত সেই শকট আরোহণ করিবা-মাত্র অশ্ববর শ্লথ-গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। তীর্থক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করিয়া তাহার যেন অন্তরাবেশ-হেতু বাহ্য বিষয়ে একটা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে! চালকের সঘন কশাঘাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জিতেন্দ্রিয় অশ্ববর ক্রোধ-রিপুকে যেন সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে। মনে হইল, যোগসিদ্ধ হইয়া বসিবার তাহার আর বেশী দেরী নাই; তাহার পরই তাহার সশরীরে স্বর্গলাভ!

হায়, অশ্ববর! তুমি জন্মান্তরে কি ছিলে, জানি না। তুমিও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত! তুমি অবিরাম একভাবে চলিতেছ! তোমার অদ্ভুত গতিতে যে আরোহিগণের অসহনীয় কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তোমার কর্ম্ম-ফলে যে কত ভক্ত প্রাণ সুদূর সমাগত যাত্রিকুল তীর্থভ্রমণান্তে দীর্ঘকাল পরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তীব্র বেদনা অনুভব করে, তাহা কি একবার ভাবিতেও তোমার মন সরে না! তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ, তাই জীবের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে না। এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তুমি কঠোর-কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত, ফলাফলের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও কর না! ধন্য তোমার সাধনা!

একবার ভাবিলাম, কঠোর সাধনা ব্যতি-রেকে দেবদর্শন ভাগ্যে ঘটে না, তাই যাত্রীদের জন্য এ অত্যদ্ভুত যানের বিদ্যমানতা! বসিবার স্থানের উপরে বা পার্শ্বে কোনওরূপ আচ্ছাদন নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি, ধূলা, ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব সহ্য করিতে পারিলে, তবে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যায়। অশ্ববরের গতির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর শিথিল অবয়বের পরস্পর-সংঘর্ষে এক কর্কশ নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে। নিরিবিলি বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। পার্শ্বস্থিত বংশখণ্ড সজোরে ধরিয়া না রাখিলে, প্রতিমুহূর্ত্তেই পতন-ভীতি! তাহার পর সেই ঝন্‌ঝনায়মান শকটের ইতস্ততঃ চালনে শরীরের সমস্ত অবয়ব থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া পতন-নিবারণ-জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিলাম। এবম্প্রকার নানাবিধ তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কোনমতে দশাশ্বমেধ-ঘাটের সমীপে এক্কা হইতে অবতরণ করিলাম।

তাহার পর সঙ্কীর্ণ গলিমুখে জনতা দেখিয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম,

পবিত্র-মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে জনস্রোত মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথি-পার্শ্বে পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকান সাজাইয়া কেহ কেহ বসিয়া রহিয়াছে। কত অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ পথে গড়াগড়ি যাইতেছে; যাহাদের দয়া আছে, যাহাদের মর্ম্মে সকরুণ আর্ত্তনাদ আঘাত করিতেছে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করিতেছে। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, মানুষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না;—চতুর্দ্দিকেই মানুষ! কি সুন্দর মিলন! ধনি-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিৎ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুখী, দুঃখী, যুবক-বৃদ্ধ, সবল-দুর্ব্বল, সকলেই বিশ্বেশ্বর-দর্শন-মানসে একভাবে অনুপ্রাণিত! ক্ষণেকের তরে হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, আত্মপরতা ভুলিয়া সকলেই একলক্ষ্যের দিকে ধাবিত! সকলেরই সমান উৎসাহ, সকলেরই সমান অধিকার! এ-ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ইতর-ভদ্র পৃথক্ করিবার সুযোগ নাই, এ স্থানে বেশভূষার পারিপাট্য নাই!—সকলের প্রাণেই এক ভাব, সকলের মুখেই এক তান!

যাইতে যাইতে বিপুল জনস্রোত মন্দির-দ্বারে উপনীত হইল। অবাধ-গতি প্রতিহত হওয়ায় একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইল। তখন সন্ধ্যার ঘনান্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণালোকে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ-কোণে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র এবং পরিম্লান পুষ্পরাশি ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। দেখিতে দেখিতে জনস্রোত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল; প্রস্তর-নির্ম্মিত পবিত্র-মন্দির-দ্বারে তিল-ধারণের আর স্থান

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

নাই। সমবেত দর্শকমণ্ডলী সকলেই স্তব্ধ! বহু-চেষ্টায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিলাম, কতশত ভক্ত পুষ্পমাল্য-ও গঙ্গোদক-হস্তে দেবাদিদেবকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন! কেহ দেবের শিরোদেশে করস্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছেন, কেহ গঙ্গোদক ঢালিতেছেন, কেহ-বা দেবকে মাল্য-বিভূষিত করিতেছেন, আর কেহবা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! যুক্তকরে বহুসংখ্যক নরনারী চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান! তন্মধ্যে কেহ-বা উৎকণ্ঠায় আকুল, কেহ-বা আশায় উৎফুল্ল,—সকলের মুখেই উদ্দীপনা!

অকস্মাৎ এই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; উজ্জ্বল দীপালোকে চতুর্দ্দিক্ ঝলসিয়া উঠিল! দেখিলাম, মন্দিরাভ্যন্তর জনশূন্য! অদূরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল! বিশ্বনাথের সেবকবৃন্দ

সদ্যঃস্নাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। কেহ তারস্বরে সুমধুর বেদগান করিতে লাগিলেন, কেহ দেবের নগ্ন-দেহে চন্দনানুলেপনে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া দিলেন। মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টা-ধ্বনি হইতেছিল। ধূপধূমে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত! অল্পকাল মধ্যেই দেবাদিদেব নববেশে সজ্জিত হইয়া এক অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। কি নয়নাভিরাম সে দৃশ্য! কি সুমধুর সেই বেদগান! তৎকালীন সহবতের মধুর ঝঙ্কার আজিও আমার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ধ্বনিত হইতেছে! সেই দৃশ্য অবর্ণনীয়! ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত ভক্ত-প্রাণ অসংখ্য নরনারী ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে সুদূর বারাণসী-ধামের এক পবিত্র ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে সমবেত! সকলের লক্ষ্য বিশ্বনাথের দিকে স্থির-নিবদ্ধ! পবিত্র স্থানের পুণ্য-প্রভাব সকলকে আরতিকালে প্রীতিপ্রফুল্ল করিয়া তুলিল; কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইল না! এই পবিত্র ধামে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রাণে কেমন একটা বিমল আনন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে! প্রাণ ভরিয়া এ দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম,—জীবন ধন্য হইল!

আরতি-সমাপনান্তে জনতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, পার্ব্বত্য জনস্রোত মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের অভিমুখী হইতেছে! অদূরেই মায়ের সেই পবিত্র মন্দির! তাহার কোলাহলও শ্রুত হইতেছিল। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, প্রবেশ-দ্বারে ভীতিব্যঞ্জক ব্যস্ততা। বহু আয়াসে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। সুদৃঢ়-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে মায়ের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। যুগ-যুগান্তর-প্রবাহিত ভক্তির উৎসে সর্ব্বত্র যেন পুণ্যপ্রভাব চির-বিরাজমান! প্রাঙ্গণ-কোণে কোথাও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বেদ-পাঠে অভিনিবিষ্ট, কোথাও কোনও যোগিবর নিমীলিত-নেত্রে সমাসীন, কোথাও বা কোনও ভক্ত দূর হইতে মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! মন্দিরের পুরোভাগে নাট-মন্দির দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অসংখ্য নর-নারী তথায় সমবেত হইতেছে, আবার মুহূর্ত্ত-মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! এই গতিবিধির বিরাম নাই!

নাট-মন্দিরের একটী কোণে কয়েকটী মৃগ নিঃসঙ্কোচে বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের সেই অরণ্য-সুলভ চাপল্য নাই। স্থান-মাহাত্ম্যে শান্ত থাকিয়া তাহারা অপরিচিত যাত্রিগণ সহ পরিচয়-প্রসঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

মন্দির-মধ্যে মা অন্নপূর্ণা অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া হাস্যমুখে বিরাজ করিতেছেন! ভক্তজন-প্রদত্ত স্তূপীকৃত পুষ্পরাশি মায়ের পবিত্র চরণ-যুগল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের গলদেশে চন্দনলিপ্ত শোভন পুষ্পমাল্য।

নাটমন্দিরের এক নিভৃত প্রদেশে উপবেশন করিয়া মৃদুহাস্যময়ী মায়ের এই সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। মায়ের সেই অনধিগম্য গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তাহার বদন-সরোজ হইতে করুণার- ধারা প্রবাহিত হইতেছে! যেন আজ সন্তানগণকে দেখিয়া দেখিয়া মাতার প্রাণে স্নেহের সঞ্চার

হইয়াছে। কতশত নরনারী প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিতেছেন, তবু তৃপ্ত হইতেছেন না! বুঝি, মায়ের এতাদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন আর ভাগ্যে ঘটিবে না! দেখিলাম, অগণিত নরনারী মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর কতশত লোক তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছেন! মায়ের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশিতে স্নিগ্ধ মধুর লাবণ্য ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

একদিন আলুলায়িতকুন্তলা মায়ের সেই দানব-দলনী রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল;—ভাবিয়াছিলাম, এমন মায়ের প্রাণে বুঝি, কোমলতা স্থান পাইবে না। কিন্তু আজ কি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিলাম! সন্তানপালিনী মা মলিন সন্তানগণকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন!—কি অপূর্ব্ব মধুময় সে দৃশ্য! মনে হইল, মাতৃস্নেহ কি এক অপার্থিব পদার্থ!

জন্মাবধি যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, সেই স্নেহময়ী জননী আজ অনেক দিন ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে সেই স্নেহের অপূর্ব্ব প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ি—প্রাণে একটা দারুণ অভাব অনুভূত হয়! হায়, পুণ্যময়ি জননি! তোমার এই নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত আর যে খুঁজিয়া পাই না। এ সংসারে তুমি ভিন্ন অপর কেহ যে তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না! তোমার অগাধ স্নেহ, অনুপম ত্যাগ-স্বীকার, সবই যে আজ কল্পনাতীত প্রতীত হইতেছে! তোমার পুণ্যময় স্মৃতিতে আজ যে অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিতেছি না! তোমার অভাবে আজ যে তোমার গুণরাশির বিশালত্ব উপলব্ধি করিতেছি! মা! কে জানিত, তুমি অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে! মনে আছে, তোমার অন্তিমকালে সেই জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশীথে আমাদের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে যে এক গভীর হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই! কি হৃদয়-বিদারক সে দৃশ্য! তখন মাতৃহীন ভ্রাতাভগ্নীগণ সমবেত হইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল,—কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল; চেষ্টা করিয়াও একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে পারি নাই। কেমন একটা অজ্ঞাত কঠোরতা আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা হরণ করিয়া লইয়াছিল। তদবধি কাঁদিতে শিখি নাই, লোকের দুঃখে প্রাণ দ্রব হয় নাই। সে যেমন একটা ভাব কেমন করিয়া বুঝাইব! এইরূপ নানা চিন্তা চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তারপর আজ এই মহাদৃশ্য দেখিলাম! এই মা বিশ্বজননীকে ইতর-নির্ব্বিশেষে সকলেই মাতৃ-সম্বোধনে পরিতৃপ্ত হইতেছে! মায়ের সর্ব্বজনীন স্নেহ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে! এই মাতৃস্নেহের গভীরতা ও বিস্তৃতি অপরিসীম! অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম! তাহার পর যখন জনতা কমিয়া গেল, তখন শূন্য-মনে ধরমশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সোনার দেশ।

(গান)

সে যে আমার সোনার দেশ,
সে যে চির-পুরাতন নিত্য নূতন—
(তাহে) নাহিক দৈন্য লেশ!
সে যে নরতের মাঝে নন্দনভূমি
আমার সোনার দেশ!
সে যে আমার সোনার দেশ!
প্রকৃতি-ভূষণে ভূষিত সে যে
অতিমনোহর বেশ,
যে যে পরাণ-জুড়ান হৃদয়-মাতান
আমার সোনার দেশ!

কত বীর-প্রসবিনী ভারত-জননী
নাহিক তাহার শেষ;
ধন্য করিয়া গিয়াছেন যাঁ'রা
আমার সোনার দেশ।
সে যে আমার সোনার দেশ,
সেথা সবাই আপন ভায়ের মতন,
সেথা নাহি কোন বিদ্বেষ;
সে যে গৌরবময়ী তীর্থের ভূমি,
আমার আমারি দেশ!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীকে বিদায় দিয়া মহাদেব কত চিন্তাই করিতেছিলেন! চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অবশেষে তিনি যোগাসন অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও দারুণ আশঙ্কায় ও উদ্বেগে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল! এমন সময় নন্দী ও ভূত প্রেতেরা হাহাকার করিয়া আসিয়া, সকল অবস্থা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শিব চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রলয়-মেঘের স্বরে শিব কহিলেন, "নন্দী, কি কহিলি?—সতী নাই?" নন্দী সহসা উত্তর করিতে পারিল না। শতসহস্র শিবানুচরের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যক্ত হইল, সতী নাই!

তখন কষ্টে নন্দীও উত্তর করিলেন—"সতী নাই!" চারিদিকেই অসংখ্য প্রতিধ্বনি উঠিল,—"সতী নাই! সতী নাই!"

মহাদেব অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তুমুল আন্দোলনে তাঁহার নৃত্যানুরাগ আসিয়া পড়িল! মস্তকের জটা ছিঁড়িয়া ঘাটিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে, নৃত্য করিয়া করিয়া, তিনি কহিতে লাগিলেন, "সতী নাই! ও হো হো! সতী নাই!"

মহাকালের কালান্তক মূর্ত্তি ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে প্রলয়-ঘোর-গর্জ্জনে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, যে নৃত্যের তরঙ্গে আকাশ-পাতাল, পাহাড়-পর্ব্বত বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, মহাদেব সেই গর্জ্জন ও

সেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহার বিক্ষিপ্ত জটাগুচ্ছের মধ্য হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মত পিল্‌পিল্‌ করিয়া কাল কাল প্রকাণ্ডদেহ বীরের উদ্ভব হইয়া চারিদিকে ঘনতমসার সূচনা করিল।

একটী প্রকাণ্ড জটা হইতে হঠাৎ আকাশপ্রমাণ এক বিরাট ভীষণ মূর্ত্তি উদ্ভূত হইতেই, শিব তাহাকে কহিলেন, "বীরভদ্র, দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিয়া আইস; সতীর দেহত্যাগের প্রতিশোধ নাও। এই সব অনুচরদের সঙ্গে লইয়া যাও।—এই ধর আমার ত্রিশূল—।"

একখণ্ড প্রলয়বাহী মেঘের মত বীরভদ্র অগ্রসর হইয়া ত্রিশূল গ্রহণ করিল, এবং বিনা বাক্যব্যয়েই শিবকে প্রণাম করিয়া, অনুচরদিগকে ইঙ্গিতমাত্রে আহ্বান করিয়া দক্ষপুরীর দিকে চলিয়া গেল। তখন ভূত-প্রেত ও প্রমথাদি কৈলাসবাসিগণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

নন্দী ও ভূতের দলকে তাড়াইয়া দিয়া ভৃগু প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছিলেন এবং পুনঃ যজ্ঞের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিতেছিলেন; সতীর অকস্মাৎ দেহত্যাগে অত্যন্তই দমিত হইলেও, পাছে কেহ কিছু মনে ভাবে, এই ভয়ে দক্ষও যথাসাধ্য অন্তরের ভাবটী লুক্কায়িত রাখিয়া, সকলকে উৎসাহদানপূর্ব্বক শিবের ও শিবানুচরদের অকিঞ্চিৎকর শক্তির এই জলন্ত নিদর্শনটীর দিকে পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নানা কৌতুকবাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন; জামাতারাও সদ্যোমূর্চ্ছিতা প্রসূতির শোকাপনোদনের জন্য নিকটে বসিয়া নানাছলে নানারূপে শিবনিন্দা কীর্ত্তন করিতেছিলেন; এমন সময় অকস্মাৎ শত সহস্র মেঘগর্জ্জনের ভীষণ রোলে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; এবং শিবকিঙ্করদের প্রমত্ত উল্লাসধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

ভৃগু শঙ্কিতভাবে কহিলেন, "আবার কি?"

দক্ষের হৃদয়ে, কেন বলা যায় না, এক টুক্‌রা আশঙ্কা লাগিয়াই ছিল। এখন এই কোলাহল শুনিয়া সেই হৃদয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এইবার বুঝি ভাঙ্গড় স্বয়ং আসিতেছে, প্রস্তুত হও!"

সকলেই সশঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্র! তেমন যে শিববিদ্বেষী ভৃগু ও দক্ষ, তাঁহারাও বিস্ফারিত-নেত্রে, স্থিরনির্ব্বাক্ বদনে আপনাদের সকল দেবশক্তি দৃষ্টির মধ্যে পুরিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। দক্ষপুরীর বৃক্ষপত্র-গুলিও এই সময়ে নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল। দেখিতে না দেখিতে, জোয়ারের জলের মত শিবকিঙ্করের দল একটা কাল ঢেউ খেলাইয়া আসিয়া যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। দেবতারা প্রাণপণ শক্তিতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে দাঁড়াইতেও ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। দক্ষ মুদ্গর-হস্তে আঘাত করিতে উঠিতেছিলেন, কিন্তু এমন সময় পর্ব্বতপ্রমাণ বীরভদ্রের বিশাল হস্তখানি উপরে আসিয়া পড়ায়,—তাঁহার সঙ্কল্প ঘুরিয়া গেল! উপর হইতে বীরভদ্র তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে অনেকখানি শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। বীরভদ্রের অপর হস্ত ভৃগুর গুম্ফ-রাজি "পট্‌পট্‌" করিয়া উৎপাটিত করিতে লাগিল। অন্যান্য শিবকিঙ্করেরা দেখিতে

দেখিতে, লাথি, চাপড় ও কীল-ঘুষোর চোটে, যজ্ঞভূমিকে শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

কেবল এক স্থানেই ইহাদের উৎপাত আত্মপ্রকাশ করিল না; সেখানে কাহারও একটীমাত্র নিঃশ্বাসের আঘাত পড়িতে পাইল না। যেখানে ছিন্ন-লতার মত সতীর বিগত-প্রাণ দেহ একস্তূপ নির্ম্মাল্যের গৌরবে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই স্থানটী পরম যত্নেই তাহারা ঘিরিয়া রক্ষা করিয়া রাখিল। নিকটবর্ত্তী যূপকাষ্ঠের উপরে বীরভদ্র দক্ষকে আনিয়া আবদ্ধ করিলেন এবং দক্ষ কোনও কথা কহিতে না কহিতে, কোনও দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে না ফিরাইতে, অকস্মাৎ একটী খড়্গাঘাতেই পশুর মত তাঁহাকে ছিন্নশির করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নশ্মশ্রু ভৃগু ও অন্যান্য শিবদ্বেষীরা এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেবগণ ত্রাসে যে যে-দিকে পারেন পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অন্তঃপুরে প্রবল ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

অত্যল্পকালের মধ্যে ধ্বংসক্রীড়া শেষ হইয়া গেল। তখন শিবকিঙ্করেরা ভৃগু-প্রভৃতি শিবদ্বেষীদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বেই জগতের একমাত্র বিরাটপুরুষের মত এক দীর্ঘ সৌম্যপুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রলয়ের পর পয়োধিবক্ষ যেমন এক প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, মহাদেবের বিশাল ধ্যানস্তিমিত আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়েও সেই প্রলয়ঝটিকার পরে এখন একটা অপূর্ব্ব স্থির ধীর ভাব লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল নয়নপদ্ম-দুইটী যোগভরে একটু নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিব-কিঙ্করেরা প্রভুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। ধীর-প্রশান্ত-গমনে শিব সতীর লুণ্ঠিত দেহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি তখন সেইখানে বসিয়া করুণ আর্ত্তনাদে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন; শিবকে দেখিয়া, "এ কি করে বাবা!" বলিয়া আবার তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মহাদেব একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অদূরে দক্ষের দেহ রক্তাক্ত ও দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তেমন যে গর্ব্বিত মস্তক তাহাও এখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া অতিশোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভৃগুর গুম্ফশূন্য পাংশু মুখমণ্ডল ভয়- ও লাঞ্ছনা-মণ্ডিত হইয়া অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছে! দেখিয়া দেখিয়া ভোলানাথের ভ্রমপ্রবণ হৃদয় আবার সকলই ভুলিয়া যাইতে চাহিল। ভোলানাথ বীরভদ্র ও অন্যান্য অনুচরদিগকে তখনই বিদায় করিয়া, ইঙ্গিতে নন্দীকে নিকটে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—"নন্দী, ঐ ছাগমুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া এই সাত্ত্বিক প্রজা-পতিকে পুনর্জ্জীবিত কর; আর এইগুলোকে ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে এইবার সতীর দেহ স্পর্শ করিলেন এবং বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া পরম আদরে উহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। প্রিয়তমার দেহ-স্পর্শে অকস্মাৎ বিশ্বনাথের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উন্মত্তের মত আবার মহাদেব অকস্মাৎ নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং সেই দেহসম্পুটিকা স্কন্ধ-দেশে স্থাপিত করিয়া স্পর্শসুখে উন্মত্তপ্রায়

হইয়া অবিচ্ছিন্ন বেগে কেবলই চলিতে লাগিলেন। মুক্ত দেবতা ও ঋষিগণ সমস্বরে পথ ছাড়িয়া দিয়া একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া শম্ভু মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু সেইখানে উপস্থিত হইয়া প্রসূতিকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মা, যাহা হইবার ত হইল; এইবার আসুন, যজ্ঞ পূর্ণ করি। প্রজাপতিকে লইয়া আপনি এই দিকে আসিয়া বসুন।"

দক্ষের দিকে চাহিয়া প্রসূতি কাঁদিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, একি বিড়ম্বনা! বিধাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়াত্মজের এই নিদারুণ বিধিলিপি! এই মূর্ত্তি লইয়া অভিমানী প্রজাপতি কি করিয়া জীবন বহন করিবেন?"

বিষ্ণু কহিলেন, "সতি, মহেশ্বর ভগবানেরই বিনাশমূর্ত্তি; তিনি দেবাদিগেরও দেব—মহাদেব! তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি মূঢ়ের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়" বলিয়া দক্ষ অগ্রসর হইয়া, নিজেই এখন সেই কথার সমর্থন করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন। দক্ষ কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, আপনি ঠিক কহিয়াছেন। জগতে আমার ন্যায় মূঢ় আর কে? যিনি দেবতারও দেবতা—সকলেরই নমস্য, যিনি ভগবানেরই প্রলয়মূর্ত্তি, নিমেষে যাঁহার ইচ্ছায় যুগপ্রলয় সংঘটিত হয়, তাঁহাকেই আমি জামাতা পাইয়া চিনিতে পারি নাই,—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে! দেহের এ বিকৃত অবস্থা এ দুর্ভাগ্যের সমতুল নয়। আজ আমি শিবকে যথার্থ চিনিতে পারিয়াছি। দেহ বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজই আমার অন্তর সম্যক্ পরিষ্কৃত হইয়াছে। যজ্ঞনাথ, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করুন, আমি সকলকে দান করিয়া, যাহা কিছু যজ্ঞভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, সকলই আজ ভোলানাথকে প্রদান করিব; আজ আমি জামাতার যোগ্য আদর করিব।"

ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ অগ্রসর হইয়া সেই কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, তাই করুন; আমরাও আজ স্বয়ম্ভুকে চিনিতে পারিয়াছি। আমরাও আজ তাঁহার যোগ্য সমাদর করিব।"

দেবগণ এবং দক্ষপুরীর অন্যান্য সকলেও অগ্রসর হইয়া সেই কথাই কহিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞনাথ, আমাদেরও সেই কথা। আমরাও তাঁর সম্মান করিব,—আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করুন।"

তখন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু নিতান্ত প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ মহোৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। দক্ষও তখন হোতৃগণ-সহ বিষ্ণুকে বন্দনা করিয়া, সকল দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিল, সকলই সর্ব্বসমক্ষে ভোলানাথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দক্ষপুরী অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব প্রভায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

উল্টা সৃষ্টি।

(গল্প)

অভিনয় চলিতেছিল। রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। ভ্রমর মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রীর সেই হৃদয়-মন-ঢালা সেই করুণ ক্রন্দন, সাত দিনের ছেলেটীর জন্য সেই মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার, সকল দর্শকেরই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছিল। পর্দ্দা-ঘেরা স্ত্রীলোকদের আসনের ভিতর হইতেও একটা অস্ফুট ক্রন্দন ও গুঞ্জনের ধ্বনি নিম্নের দর্শকদিগের শ্রবণপথে আসিতেছিল। এমন সময় 'ড্রপসিন' পড়িয়া গেল।

দুই টাকার 'সিটে' দুইটী রমণী পাশাপাশি বসিয়াছিল। 'ড্রপসিন' পড়িতে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সত্যিই, এখানে যেমন সব রকমে স্বাভাবিক কর্‌তে পারে, এমন আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এখানে যেন সবই জীবন্ত, সবই সত্য।" অপরা উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার জীবনে এ সবই প্রকৃত সত্য।" তাহার হাসির সহিত যে একটা মৃদু নিঃশ্বাসও পড়িল, সঙ্গিনী উষার চোখে সেটুকু এড়াইল না। সে একটু বিষণ্ণভাবে, পার্শ্ব-বর্ত্তিনীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখে, সেই বড় বড় কাল চোখের দিকে চাহিয়া, একটু আগ্রহান্বিত ভাবেই আরও একটু ঘেঁসিয়া বসিল। আপনার শুভ্র ফুলের মত হাত-দু'খানি দিয়া সঙ্গিনীর কোল হইতে ফুলের মতই সুন্দর মেয়েটিকে তুলিয়া চুম্বন করিল। তারপর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এমন রতন যা'র কোলে, তা'র আবার দুঃখু কি, ভাই?" সঙ্গিনীর কথায় উমা মুখ তুলিয়া চাহিল। কিশোরীর অম্লান ললাটে সজ্জিত কেশ-গুচ্ছের দিকে চাহিয়া বলিল, "গৌরীর জন্যেই আরো বেশী কষ্ট হয়, ভাই। দু'দণ্ডের পরিচয় তোমার সঙ্গে; কিন্তু উষা, সত্যিই বল্‌চি, আমার মেয়ে বলে গুমর করে বলচি না, এ রতন তোমার কোলেই মানায়। আমার মত কাঙ্গাল দুঃখিতের কোলে কি এ সোনার চাঁপা ভাল দেখায়? আমার জন্যেই ভগবান একেও শুদ্ধ অসুখী কর্‌লেন, ভাই! এইটুকু মেয়ে, কি কপাল বল দেখি, ওর? এতটুকু আদর কারো কাছে পেলে না!" গৌরীর মা'র চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

পরদুঃখে-কাতরা উষা তাড়াতাড়ি আপনার চোখ মুছিয়া, উমার হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ! ভাই উমা, এমন করে কি কাঁদতে আছে? মাই বা কর্‌লে আর কেউ আদর, তুমি তো কর? গৌরীর বাবা তো করেন?" উমা আবার হাসিয়া বলিল, "যা বলেচ ভাই! সেই কপালই যদি ওর হবে, তা হোলে আর আমিই বা দুঃখু কোর্‌বো কেন, উষা! এমন কি ভাগ্য করেচে, যে গৌরী তাঁ'র কোলে স্থান পাবে!"

বিস্মিতা চিন্তা-পীড়িতা উষা উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উমা আবার হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যবতী, রাজরাণী, পতি-সোহাগিনী হ'য়ে বেঁচে থাক, বোন্! অভাগিনীর

দুঃখকাহিনী আর শুনতে চেয়ো না। ওই দেখ 'স্তূপ' উঠেছে, থিয়েটার দেখবে না?"

কম্পিত স্বরে উষা বলিল, "যদি বাবা দাও তো শুনতে চাই না; কিন্তু এত কি দুঃখ-কাহিনী দেখতেই আসি নি ভাই? নিজের মুখে বোন্ বলে ডেকেচ, সেইজন্যেই সাহস করে বল্‌চি, দিদি, ছোটবোনকে কি কোন কথা বলতে দোষ আছে?"

উষার চোখেও বড় বড় দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিতা উমা তাড়াতাড়ি উষার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "ছিঃ তুমি কাঁদলে ভাই! এই সামান্য কথায় কাঁদবে, তা আমি মনে করি নি। স্বামী-সোহাগিনী তুমি বোন্, এ পতি-পরিত্যক্তার কাহিনী শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে? কেন ভাই তোমার সরল প্রাণে কষ্ট দোব? মিছে কেন, পরের ব্যথায় ব্যথা পাবে উষা! এ ব্যথা তো মোছাবার নয়! সেইজন্যেই বলতে চাই নি আমি। শুনবে তো শোন ভাই!—অভাগিনীর সবই অভাগ্য! যখন মা'র পেটে, তখনই বাবা চলে গেছেন। কোন্ বিদেশে চাকরী করতে গেছ্‌লেন, প্লেগের ডাক্তারী; সেই প্লেগেই গেলেন; ফিরতে আর হোলো না। দু'বছর বয়সে মাও ফেলে রেখে বাবার কাছে গেলেন। সংসারের মধ্যে মামা-মামী। তাঁরা যে ভালবাসেন না, তা নয়; তবে মামারও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে, আর গরীব তিনি। আমার বাবাও কিছু রেখে যান নি। মামারও একমাত্র সম্বল বাড়ীখানি। মামার আশ্রয়ই এখনও আমার আশ্রয়। আজো তিনি যাই, দু'বেলা দু'মুঠো দিচ্চেন, তাই কারো দ্বারস্থ হ'তে হয়নি।"

কাতরা উষা বলিয়া উঠিল, "বাপ কোরো ভাই! কিন্তু এমনই যদি করলেন, তবে তোমরা কেন আদালত থেকে খোরাকী আদায় করে নাও না?"

উমা। দরকার কি ভাই! যে সকল বিষয়েই বঞ্চিত করলে, তা'র কাছে যেচে এ অপমান আর কেন? মামা বলেন, 'যে-কটা দিন আমি আছি, দু'মুঠো ভাত দোবোই, তারপর সতীশ আছে।' সতীশই মামার একমাত্র আশার স্থল; সে মামার বড় ছেলে; এইবারে বি এ দেবে। তারপর শোন, মা-বাপ-মরা মেয়েরও বিয়ের বয়স হোল। বরং একটু বেশীই হোল। সে সময়ে প্রকৃতই আমি মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে উঠেছিলুম। শেষকালে, আমার যখন তের উত্তীর্ণ হয়, তখন একটি পাত্র স্থির হোল। তিনি আফিসের নূতন কেরাণী; মাহিনা সাড়ে বার টাকা;—তাঁরি মূল্য নগদ পাঁচ শত, আর হাজার টাকার গয়না। মা'র যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে তের শ' টাকার যোগাড় হোল; বাকী দু' শ'র জন্যে মামা অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। টাকা কোথাও পেলেন না, কেউ ধার দিলে না; সকলেই কিছু বন্ধক চায়। টাকার যোগাড় হোল না; কিন্তু বিয়ের দিন পস্থিত হোল। বরকর্ত্তা টাকা কম দেখে চটে আগুন, বর ফিরিয়ে নিয়ে প্রকৃতই চলে গেলেন। আমার সরলবুদ্ধি মামা একেবারে জড়বৎ হয়ে গেলেন। মাথায় যেন তাঁর বজ্রাঘাত হোল। মামাকে এই অবস্থায় ফেলে সকলেই চলে

গেলেন ;—গেলেন না কেবল বরকর্ত্তার একটি বন্ধু,—বহরমপুরের একটি উকীল। তিনি সপুত্রক বরাহুগমনে এসেছিলেন ; বন্ধুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে, এসে মামার হাত ধরে তুলে বললেন, 'আপনি কি অনুগ্রহ কোরে মেয়েটি আমার ছেলের হাতে দেবেন ?' মামা তো অকূল পাথারে কূল পেলেন। পুত্রের আপত্তি সত্ত্বেও আমার শ্বশুর জোর করে তাঁকে এনে ছান্‌লা-তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেই দিন,—লগ্ন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—সেই অশুভ কয়েই আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

উমা একবার চুপ করিল। সম্মুখে সজ্জিত রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উজ্জ্বল তাড়িতালোকে, দামী চুরুট ও নানাবিধ এসেন্সের সম্মিলিত গন্ধে প্রপূরিত উৎসব-রজনীর ন্যায় সেই ভারাক্রান্ত বায়ুতে উমার সেই বিবাহ-রজনী যেন একখানি সজ্জিত দৃশ্যপটের মতই আবার মনে পড়িয়া গেল। ছবির মত একদৃষ্টিতে সে 'ষ্টেজের' দিকে চাহিয়া রহিল। তখন একটা অঙ্কের শেষ দৃশ্য। গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আমার লমর, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে শান্তি!—আমার ভ্রমর—!" উমা স্তম্ভিত হৃদয়ে শুনিতে লাগিল। গোবী তাহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শেষে যেমন রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেল, তখন যেন সেই বন্দুকের শব্দে উমার চমক্ ভাঙ্গিল।

"বৌ-দিদিমণি!" হঠাৎ একটা পরিচিত গলার স্বরে চমকিত হইয়া উমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। তাহার শ্বশুর-বাড়ীর ঝির গলা না? সে কেন তাহাকে এখানে ডাকিবে? বাস্তবিক ঝি উমাকে ডাকে নাই। সে উমার কাছে আসিয়া আবার বলিল, "বৌ-দিদিমণি, দাদাবাবু এই পানগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর শুধোলেন তিনি, শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বে? না, গাড়ি তৈরি কর্‌তে বল্‌বেন? আহা, রাত জেগে যে সোনার পিতিমে মলিন হয়ে উঠেছে গা? চোখ-দুটো ফুলে উঠেছে, লাল হয়েছে! দাদাবাবু এখনি সকাল না হ'তেই ডাক্তার আন্‌তে পাঠাবে। কাজ নেই বাবু, গাড়ী জুত্‌তে বলি গে।" ঝির স্নেহবাক্যে উমা লজ্জাবোধ করিল। পতি-পরিত্যক্তার কাছে পতিসোহাগিনী স্বামীর আদরের কথা লেশমাত্র প্রকাশ হইতেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না রে, না, এখন তৈরি কর্‌তে হবে না। খবরদার, আমার কথা কিছু বলিস নে। এ-রকম কান্নাকাটি দেখে কি মানুষ না কেঁদে থাকতে পারে? দিব্‌চিস্ তো তুইও?"

"দেখ্‌চি নে আর গা? ঐ যে তোমরার জন্যে আমিই কি কম কেঁদিচি বৌ-দিদি! তা যাক্—আমি না হয় নাই বলুম, তোমার তো চোখ আছে। গাড়ীতে উঠে আমারেই কত বক্‌বে এখন!" এই বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

ঝি চলিয়া গেলে, উমা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উমার দিকে চাহিল। দেখিল উমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিত্রপিতার ন্যায় বসিয়া আছে। তবু ভাল, সে ঝির কথা শোনে নাই। উমা উমার হাতে পান দিয়া বলিল, "তার পর দিদি—?"

যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্য হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া উমা বলিল, "তার পর!

তারপর দিন-কতকের জন্যে আমার এ অনন্ত অন্ধকারে চাঁদের আলো দেখা দিল। বুঝতে পারতুম বেশ, স্বামীর মনের মতো হই নি। এম-এ বি-এল্-পাশ স্বামীর উচ্চ আদর্শের অনুরূপা স্ত্রী আমি কি করে হবো ভাই? আর প্রধান অন্তরায়, আমার এই রূপ। তাঁর দোষ কি? তবু বলছি, সেই সময়ই আমার এ অন্ধকার জীবনের অমাবস্যা কেটে, প্রথম চন্দ্রোদয় হয়েছিল। শ্বশুরের আদরে, শাশুড়ীর স্নেহে, আবার আমি যেন আমাকে জগতের একজন বলে মনে করতে পেরেছিলুম। অতীত জীবনটা যেন আমি দুঃস্বপ্নের মতই ভুলে চলেছিলুম। শুধু একটা আশঙ্কা ছিল—স্বামী! সে আশঙ্কা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা! মনে আনতেও যেন ভয় হ'ত। জোর করে চোখের জল চোখে চেপে, তাঁর মনের মত হ'তে চেষ্টা করতুম। ভাল বাসতেন না বটে, কিন্তু অনাদরও করতেন না। প্রেমে না হোক, পত্নীর গৌরবে আমার আসন স্থিরই ছিল। নবজীবনের জ্যোৎস্নার মত দিনগুলিতে অবহেলায় কাল তুলি বুলাতে, আমি কোন রকমেই পারতুম না। চলেও যাচ্ছিল এক রকম। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্ট! সইবে কেন? সামান্য একটা ওষ্ঠব্রণ হয়ে, অমন শ্বশুর হঠাৎ চলে গেলেন। ইন্দ্রপুরী অন্ধকার হয়ে গেল। শাশুড়ী দিনরাত পড়ে থাকতেন, আমিও ছায়ার মত তাঁরই কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াতুম। তিনিই আমার সংসারে একমাত্র ভরসা ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম! তিনমাস পরে কলেরা হয়ে, তিনিও চলে গেলেন। আমার সবই ফুরিয়ে গেল! তখন কিন্তু স্বামী কিছুমাত্র মন্দ ব্যবহার করেন নি। একটা বছর তিনি আমাকে সঙ্গে করে, এ-দেশ ও-দেশ করে বেড়িয়েছেন; রাতদিন অবশ্য বাইরেই থাকতেন, তবু রাত্রিবেলাও তো তাঁকে দেখতে পেতুম। মনে মনে আশাও একটু যেন গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

"এমন সময় একদিন তিনি সঙ্গে করে আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে এলেন। মামার আনন্দ ধরে না! উকীল জামাইয়ের সমাদরের ত্রুটি যেন কিছুতে না হয়, সেই চেষ্টায় একটা মানুষ যেন দশটা হয়ে ঘুরতে লাগ্‌লেন। জামাতার মনের ভাব তখন সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। ভোরের বেলায় উঠে আসছি, বল্লেন, 'উমা, দাঁড়াও।' আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। তিনি মুখটি অল্প নীচু করে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো উমা, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী।' ভূমিকা শুনেই আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে আসছিল, তবু আমি অবশিষ্ট কথা শোনবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি বাক্য সমাপ্তি করলেন,—'আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।' শুনে হা-হুতাশও করলুম না, মূর্চ্ছাও গেলুম না; তেমনি ভাবেই জানোলা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। যে সর্ব্বনাশের ছায়ার আভাসও মনে আনতে সাহস হ'ত না, তাই চোখের উপর ঘটে গেল। তিনি চলে গেলেন।

"গৌরী তখন মাত্র তিনমাস তাঁর মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছিল। যখন মামীমা জানলেন, মামাকে দিয়ে চিঠি লেখালেন; কোনও উত্তরই এলো না। গৌরীর জন্মের পরেও একখানা চিঠি মামা দিয়েছিলেন।

উত্তরে হাজার টাকার একখানা নোট, প্রেরকের নামশূন্য অবস্থায় এসেছিল। মামা গরিব হলেও তৎক্ষণাৎ সে নোট ফেরত দিয়েছিলেন। তারপর আর কোন সংবাদই নেই।"

উষা বলিল, "তুমি কোন চিঠি লিখেছিলে দিদি?"

উত্তরে উমা বলিল, "আর কেন ভাই? সে গুপ্ত-কথা তুলে যাওয়াই ভাল।—তিনি সুখে আছেন, এই আমার সুখ। আমি তো আর তাঁকে সুখী করতে পারি নি, ভাই!"

উষা সে কথা চাপা দিয়া উমার ঠিকানা জানিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আবার কবে দেখা হবে, দিদি? তুমি কি আমাদের বাড়ীতে একদিন আসবে, ভাই? তা হোলে একদিন দুপুর বেলা গাড়ী পাঠিয়ে দোব। যাবে বল দিদি?"

উমা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "মামা যে কোথাও পাঠান না। যেতে দেবেন কি?"

উষা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, সে কথা নয়; তোমার বিশ্বাস হচ্চে না। মনে করচ, অজানা জায়গা, উষা ভাল-লোক কি না? এই সব, না ভাই? আমাকে দেখে কি ভাই অপবিত্র বলে মনে হয়? দেখ দেখি আমার মুখের দিকে চেয়ে? তা হোলে কি আমি সাহস করে বলতে পারতুম, ভাই? পাঁচজনের মুখে, পাঁচ রকম গল্প শুনে, তুমি আমাকেও অবিশ্বাস করচ দিদি?"

উমা তাড়াতাড়ি বলিল, "না উষা, তা নয়, ভাই। জানতো, আমার স্বামীর চরণে আমি অপরাধিনী। আমার নামে, ভাই, মন্দকথা রটতে বেশী ক্ষণ নয়। যাব ভাই আমি, সত্যই না যায় কালোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

উষা। তা হোলে রবিবার গাড়ী পাঠাবো। ঐ যে তোমার মাসীমাও উঠেছেন।

অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। উমার পশ্চাতে পশ্চাতে উষাও নামিতে লাগিল। দরজার কাছে একটী সুন্দরকান্তি যুবক দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, "আঃ, ঝিটা গেল কোথা? যাহা, বলে দাও, বৌবাজারের সুরেশ মিত্তিরের বাড়ী।" সহসা উমার দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেল। যুবক চকিত হইয়া সরিয়া গেলেন। উমা যেন আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। উষা পিছনে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোল দিদি?" উমা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ঐ যে তিনিও এসেছেন। বোধ হয়, সস্ত্রীক এসেছেন। আহা, আর একটু আগে জানলে যে, চেষ্টা কোরে সে ভাগ্যবতীকে দেখ্‌তুম। হিংসা করি না ভাই! একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।"

উষা বিবর্ণমুখে বলিল, "যাও, আর ও-রকম অদ্ভুত সাধ করে কাজ নেই! ওই বুঝি, তোমাদের ডাকচে দিদি! যেও ভাই, আমি গাড়ী পাঠাব। আচ্ছা দিদি, তোমার স্বামী এখন বৌবাজারে আছেন, বল্‌লেন না? তুমি সে বাড়ী চেনো?"

তদুত্তরে উমা বলিল, "না ভাই, আমি বহরমপুরেই ছিলুম।"

গাড়ী আসিয়া পড়িল। উমা উঠিলে পর উষা গৌরীকে চুম্বন করিয়া বলিল, "দিদি, এটীকে আমায় দেবে? এ তোমার স্বামীর মতো দেখ্‌তে হয়েছে, না?"

একবার উমার মামীরা বলিলেন, "হাঁ মা, গৌরী ঠিক ওর বাপের মতন হয়েছে; জামাই যে সুন্দর।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া উমা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

(২)

যথাসময়ে উমা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। উমার মামার বাড়ীর সামনে বড়-মানুষের বাড়ীর বৃহৎ গাড়ীখানাকে লইয়া মত্ত দুটা ওয়েলার ঘোড়া যখন দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন বিস্মিত-নেত্রে পাড়ার যত অকর্ম্মা ছেলে-গুলাও ঘুড়ি-লাটাই ফেলিয়া স্থিরভাবে গাড়ী দেখিতে লাগিল। তকমা-ওয়ালা সহিস ও কোচম্যানের অযত্নকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিতে ঘন ঘন অঙ্গুলি-চালনা, একটী দিগম্বর বালককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ততক্ষণে তাহার ঘুড়ির সুতায় মাঞ্জা দিবার বেলের আঠাটী আর একটী ক্ষুদ্র তস্কর সরাইয়া ফেলিল।

উমা গৌরীকে টিপ কাজল পরাইয়া, একটী দরসা জামা পরাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল; সঙ্গে আট বছরের মামাতো ভাই কালো। সতীশ বাড়ী ছিল না।

মামী বলিতেছিলেন, "এলো-চুলটাতেই যাবি মা?" অবজ্ঞার সহিত চুলের রাশি ঝামহাতে করিয়া জড়াইয়া উমা বলিল, "তাদের কাছে তো আর বড়-মানুষি দেখাতে যাচ্ছি না মামীমা? আর আমার কি সেজে-গুজে কোথাও যেতে আছে?" মামীমা জামাতার কথা স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রুজল আঁচলে মুছিলেন; উমা গাড়ীতে উঠিল।

বড়মানুষের গাড়ীতে চড়িয়া গাড়ীর চাকচিক্য দেখিতেই কালোর সময় কাটিয়া গেল। একবার এটা টানিয়া, একবার ওটা টানিয়া, আলোর সুইচ টিপিয়া, সে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। উমা সস্নেহে, ছোটভাইটীর এই খেলা দেখিতেছিল; সে ভাবিল, ভাগ্যে উমা ঝি পাঠায় নাই, তাহা হইলে কালোর লজ্জা রক্ষা দায় হইয়া উঠিত।

কম্পাউণ্ডের ভিতর গাড়ী থামিতেই দ্বারবান নামিয়া গেল। হাস্যমুখী উষা আসিয়া, উমার হাত ধরিয়া নামাইল ও গৌরীকে বুকে টানিয়া লইল। উপরে উঠিতে উঠিতে উমা বলিল, "আগে বলতে মনে ছিল না ভাই! আজকে রবিবার, গাড়ী পাঠালে? তোমার স্বামী তো বাড়ীতেই আছেন! যদি রাগ কর বলে, না এসে থাকতে পারলুম না।" উষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিছু ভয় নেই দিদি! সে একপাশে পড়ে আছে, —নিরীহ জীব।"

উষার বসিবার ঘরে গালিচা পাতা ছিল। উমা বসিয়া বলিল, "তোমার ঘরে বুঝি, তুমিই গিন্নী? আর তো কাউকে দেখ্‌তি না?" উষা হাসিয়া বলিল, "গিন্নী আপাততঃ আমিই বটে; তবে ঘর আমার নয়, আর এক জনের। আমার এ অনধিকার প্রবেশ।"

উমা বুঝিতে পারিল না; বিস্মিত-ভাবে চাহিয়া রহিল। উষা পুনরায় বলিল, "দাও তো দিদি, গৌরীকে একবার দেখিয়ে আনি। দেখ্‌তে চেয়েছেন।"

উমা বলিল, "তুমি এরি মধ্যে গৌরীর কথা গল্প করেছ! বেশ তো! শীগ্‌গিরই নিজের কোলে হবে, দুঃখ কি?"

উষা মৃদু হাসিয়া গৌরীকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে স্বামীর ঘরের দিকে চলিয়া